ধর্মকথা

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

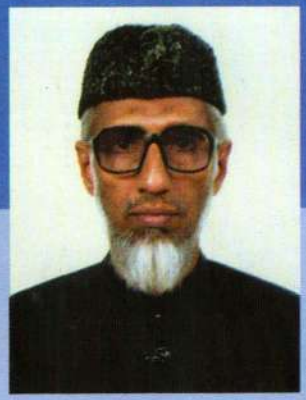

গবেষক, ইসলামী চিন্তাবিদ, কলামিস্ট, গ্রন্থকার, প্রবন্ধকার, সমাজসেবী, সংগঠক ও শিক্ষানুরাগী আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর জন্ম ১৯৫০ সালের ১৮ জানুয়ারি দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীস্থ খান বাহাদুর বাড়িতে (সাবেক উজির বাড়ি)। বৃটিশ আমলের দু'বারের পার্লামেন্ট সদস্য, উপমহাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব আমিরুল হজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র তিনি। দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পূর্বকোণে সাপ্তাহিক কলাম লেখা ছাড়াও তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিছিন্নভাবে লেখালেখি করে আসছেন। তিনি বহু গ্রন্থের লেখক ও স্মরণিকার সম্পাদক।

জনাব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী জীবনের বিভিন্ন সময়ে পারিবারিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নিয়ে অনেকগুলো ধর্মীয়, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তৎমধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হল– ✯ বাঁশখালী কেন্দ্রীয় খানকায়ে হামেদিয়া মজিদিয়া, চট্টগ্রাম ✯ চেচুরিয়া মজিদিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ✯ বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম ✯ চেচুরিয়া রশিদিয়া হেফজখানা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ✯ হামেদিয়া রহিমা এতিমখানা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ✯ বাঁশখালী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম ✯ উজানটিয়া খান বাহাদুর জামে মসজিদ ও কবরস্থান, পেকুয়া উপজেলা, কক্সবাজার ✯ বৈলছড়ি খান বাহাদুর বাজার জামে মসজিদ, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ✯ উজানটিয়া খান বাহাদুর এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, পেকুয়া উপজেলা, কক্সবাজার ✯ কাথরিয়া (হালিয়াপাড়া) এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ✯ বাশখাঁলী খান বাহাদুর গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম ✯ আত্-তাওহীদ রহিমা একাডেমী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

এতদ্ব্যতীত তিনি পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঁশখালী বৈলছড়ি নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও সভাপতির পদে আসীন থেকে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে অবদান রেখে আসছেন। তেমনি বাঁশখালী পূর্ব বৈলছড়ি ইসলামী কমপ্লেক্সের দীর্ঘ দু'যুগ ধরে সভাপতি পদে আসীন থেকে কমপ্লেক্সকে পুনরুজ্জীবিত করে উন্নয়ন ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে সেবা দিয়ে আসছেন।

বহুল পরিচিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ব্যতিক্রমধর্মী সংগঠন 'মুসলিম মনীষা স্মৃতি পরিষদ' এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। তেমনি বহুল পরিচিত শাহ মজিদিয়া-রশিদিয়া ফাউণ্ডেশনেরও তিনি প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সচিব থেকে সংবিধান রচনা ও সংগঠন দাঁড় করাতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ছাত্র জীবনের শেষের দিকে তিনি দরবারে মোহাম্মদী (স.) নামক সংগঠনের সম্পাদক থেকে সংবিধান (কানুন) প্রণয়নের ভূমিকা পালনসহ দীর্ঘদিন সেবা দান করেছিলেন।

বর্তমানে তিনি দেশের ১০/১১টি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আজীবন দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তেমনি তিনি দেশের প্রতিষ্ঠিত ৭/৮টি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের আজীবন সদস্য।

এসবের পরেও তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি ও সদস্য হিসেবে জড়িত থেকে সেবা দিয়ে আসছেন।

তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু দেশ সফর করেন।

ধর্মকথা

(প্রথম খণ্ড)

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

শৈলী প্রকাশন

ভূমিকা

মহান আল্লাহ পাকের অপার কৃপায় "ধর্মকথা" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল।

অত্র গ্রন্থে ধর্ম বিষয়ে নানা কথা সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম দিকে নবী পাক (স.)-র শানে কয়েকটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গ্রন্থের মধ্যভাবে হজ্বের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে। গ্রন্থের শেষের দিকে ধর্ম সংক্রান্ত বিবিধ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। সম্মানিত পাঠকমহল গ্রন্থটি পাঠ করে ধর্ম বিষয়ে কিছুটা হলেও অজানা বিষয় জানবার সুযোগ হতে পারে বলে মনে করি।

পাঠক মহলে বিরক্ত এড়ানোর নিমিত্তে বাহুল্যতা ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা যতটুকু সম্ভব পরিহার করতে সচেষ্ট ছিলাম।

অত্র গ্রন্থটি ১ম প্রকাশ বিধায় ভুল-ভ্রান্তি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কাজেই সম্মানিত পাঠক মহল তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাকে অবহিত করলে পরবর্তীতে শুধরিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকব।

অত্র গ্রন্থ পাঠ করে পাঠক মহল ন্যূনতম উপকৃত হলেও শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব।

পাঠক মহলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায়–

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী
পোস্ট: কে. বি. বাজার
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
ফোন: ০৩১-৬৫৪০৬৪
মোবাইল: ০১৭১৩-১১৫৬০১
ই-মেইল: aislam@kbhouse.info

DHARMOKATHA
Written by Ahmadul Islam Chowdhury in Bangla
from Chittagong, Bangladesh on February 2009
price US # 2.00

ধর্মকথা
(১ম খণ্ড)
আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৫
সফর ১৪৩০
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

.....

স্বত্ব
লেখক

.....

প্রচ্ছদ
জিয়া উদ্দিন চৌধুরী

.....

কম্পোজ
জাহানারা কালার প্রিন্টার্স

.....

প্রকাশক
আয়েশা হক শিমু
শৈলী প্রকাশন
৫, সিডিএ বা/এ, মোমিন রোড
চট্টগ্রাম, ফোন : ৬৩৬৭৩৩

.....

মূল্য
১৩০ টাকা
ISBN : 984-862-284-5

সমর্পণ

আমাদের পূর্ব পুরুষ হযরত সৈয়দ আবদুর রহমান সিদ্দিকী (রহ.) যিনি পবিত্র আরবভূমি থেকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ে এসে শায়িত রয়েছেন। তাঁর পূণ্যাত্মার উচ্চতর প্রশান্তি কামনায় অত্র গ্রন্থ সমর্পণ করা হল।

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

- তাওয়াফ ও যেয়ারত-১৯৯৮ইরেজি
  ষষ্ঠ প্রকাশ-২০০৫ ইংরেজি
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ১ম ও ২য় খণ্ড-১৯৯৯ ইংরেজি
- কালান্তরের দৃষ্টিপাত ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড-২০০১ ইংরেজি
- হজ্ব ও যেয়ারত-২০০২ ইংরেজি
- গারাংগিয়া হযরত বড় হুজুর (রহ.)-২০০৩ ইংরেজি
  ২য় প্রকাশ-২০০৪ ইংরেজি
- চট্টগ্রামের কথা-২০০৪ ইংরেজি
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত-৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড-২০০৪ ইংরেজি
- মক্তুবাতে হামেদী-মজিদী-২০০৪ ইংরেজি
- গারাংগিয়া হযরত ছোট হুজুর (রহ.) (সেমিনার স্মারক)-২০০৪ ইংরেজি
- মোবারক স্মৃতি-২০০৫ ইংরেজি
  ২য় প্রকাশ-২০০৬ ইংরেজি
- পাক-ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ ১ম খণ্ড-২০০৫ ইংরেজি
- শানে ওয়াইসী (রহ.)-২০০৫ ইংরেজি
- হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী-২০০৭ ইংরেজি
  ২য় প্রকাশ-২০০৮ ইংরেজি
- Shan-E-Waisi (Published from India) 2007-Anno Domini
- বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর-১ম খণ্ড
  (মিশর, জর্দান, ইরাক, ফিলিস্তিন)-২০০৭ ইংরেজি
- Hajj: Omrah: Ziarah-2007-Anno Domini
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৭ম খণ্ড-২০০৮ ইংরেজি
- ধর্ম কথা-১ম খণ্ড-২০০৯ ইংরেজি

প্রকাশের পথে

- পারস্য থেকে ইরান
- বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর ২য় খণ্ড (ইয়েমেন)
- তুরস্ক
- পশ্চিমবঙ্গের আউলিয়ায়ে কেরাম
- ধর্ম কথা-২য় খণ্ড
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত-৮ম খণ্ড
- চট্টগ্রাম ও ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ
- মানবতা
- ইউরোপ, আমেরিকায় ৬৮ দিন

সূচি

১. ইয়াছরিব থেকে মদিনা মুনাওয়ারা / ৯
২. শানে মদিনা মুনাওয়ারা / ১৫
৩. যেয়ারতে রওজাপাক / ১৯
৪. নবী পাকের প্রতি মহব্বতের পরিধি / ২২
৫. মদিনা মুনাওয়ারায় মিলাদ মাহফিল / ২৫
৬. যেয়ারতে শহীদাইনে বদর ও মা আমেনা / ২৮
৭. দেশে নবী পাকের (স.) কদম শরীফ চিহ্নিত পাথর / ৩৭
৮. ক্বাবাশরীফ ধ্বংস করতে এসে আবরাহা বাদশার পরিণতি / ৪০
৯. সৌদি আরবের তায়েফ গমন ও তথা হতে ওমরাহ / ৪৪
১০. হযরত সুলতানুল হিন্দের মাজার কমপ্লেক্স ও সরকারী ব্যবস্থাপনা / ৪৮
১১. কলকাতা নগরীতে দু'মহান শহীদের যেয়ারত / ৫৪
১২. কলকাতায় যেয়ারত ও গ্রন্থ প্রকাশ / ৫৭
১৩. পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুয়ায় মহান অলি নূর কুতবুল আলম (রহ.) / ৫৯
১৪. চুনতী হযরত শাহ সাহেব (রহ.) / ৬১
১৫. কুতুবদিয়ার কুতুব হযরত মালেক শাহ (রহ.) / ৬৫
১৬. বর্তমানকালে হজ্বের পরিবেশ / ৬৮
১৭. এ কালে বিভিন্ন মাধ্যমে হজ্ব করা / ৭২
১৮. একজন ধর্মীয় ব্যক্তির ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি / ৭৫
১৯. পরিবারে মসজিদের প্রভাব / ৮১
২০. লালবাগ দুর্গে পরীবিবির মাজার ও আমাদের শিক্ষা / ৮৪
২১. দেশে তাবাররুক নিয়ে বাড়াবাড়ি / ৮৬
২২. পিতার মৃত্যু পরবর্তী সন্তানের কৃতকর্ম / ৮৮
২৩. ভাসানী নভোথিয়েটারে আল্লাহ পাকের বিশালত্ব ভাবা / ৯১
২৪. জীবনযাপন ও বয়স্কের ধার্মিকতা / ৯৪
২৫. মানবজীবনে হালাল-হারামের গুরুত্ব / ৯৭
২৬. জুমাতুল বেদা / ১০০
২৭. এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি / ১০৩
২৮. উঠা-বসা, চাল-চলনে দাম্ভিকতা / ১০৬
২৯. জজিরতুল আরব ও মূলকে শাম'র কথা / ১০৯
৩০. মসজিদে জামা'য়াত ব্যবস্থাপনা / ১১২
৩১. দেশে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে কলুষিত পরিবেশের অনুপ্রবেশ / ১১৫

ইয়াছরিব থেকে মদিনা মুনাওয়ারা

বিশ্বের প্রাচীন জনপদের মধ্যে অন্যতম জজিরতুল আরব ও মুলকে শাম। জজিরতুল আরবে হেজাজ প্রদেশের শহর "ইয়াছরিব" নবী পাক (স.) নামকরণ করেন মদিনা (মুনাওয়ারা)। মদিনা মুনাওয়ারা মক্কা মুকাররমা হতে ৪২৫ কিলোমিটার এবং জেদ্দা হতে ৪০০ কিলোমিটার উত্তরে। মদিনা মুনাওয়ারা ২৯টি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ, কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আল্‌শামহুদী ৯৪টি নাম উল্লেখ করেছেন। মদিনা মুনাওয়ারার অবস্থান সমতল ভূমিতে হলেও এর উত্তরে উহুদ, দক্ষিণে "ঈর" পর্বত রয়েছে। শহরের পশ্চিম ও পূর্বদিকে হাররাতুল ওয়াবরা ও হাররাতুল ওয়াকিম অবস্থিত যা কালো পাথর এলাকা। শহরের আশেপাশে কয়েকটি উপত্যকা রয়েছে। এ সকল উপত্যকা বাগান ও কৃষি কাজের জন্য প্রসিদ্ধ।

ইয়াছরিব নামকরণ হিসাবে জানা যায়, এ জনপদের গোড়াপত্তন করেছেন আছরিব ইবনে কানিজা। তাঁর নামানুসারে এ শহরের নামকরণ হয় আছরিব, তিনি ছিলেন হযরত নূহ (আ.) এর বংশধরের মধ্যে ৭ম অধঃস্তন পুরুষ। হেজাজে আমালিকা গোত্রের জুলুম নির্যাতন বৃদ্ধি পেলে হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে দমন করার জন্য একদল মোজাহিদ প্রেরণ করেন। এতে আমালিকারা পরাজয় বরণ করে এবং তাদের নেতা নিহত হয়। এ মোজাহিদ সেনাদল শা'মে/সিরিয়ায় পৌঁছল। তখন হযরত মূসা (আ.) এর একটি নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে তাদেরকে হেজাজে ফেরৎ পাঠানো হয়। তারা মদিনা মুনাওয়ারাসহ হেজাজের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করতে থাকে। খ্রীস্টবর্ষের প্রথম দিকে ৭০ সালে রোমান ও ইহুদীদের মধ্যে বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের পরিণতিতে সমস্ত ফিলিস্তিন ও বায়তুল মোকাদ্দাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। ইহুদীরা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের প্রতিকূলতা হেতু ইহুদীদের অনেকে হেজাজে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎমধ্যে মদিনা মুনাওয়ারায় ৩টি গোত্র রয়েছে–তারা হল বনু কায়নুকা, বননাদির ও বনু কোরাইজা।

ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেন যে, উক্ত ৩টি গোত্র মিলে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সংখ্যা দু'হাজারের উপর ছিল। প্রতিটি গোত্রের প্রায় সমসংখ্যক লোক ছিল। এ গোত্রসমূহের আবার উপগোত্রও ছিল। ইহুদী এ গোত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তিক্ত। প্রায় সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুন-খারাবী লেগেই থাকত।

মদিনা মুনাওয়ারায় ইহুদীরা বিভিন্ন মহল্লায় অবস্থান করত। সেখানে তাদের দুর্গ ও মজবুত ইমারত নির্মিত ছিল। শত্রুদের আক্রমণের তীব্রতায় তারা তথায় আশ্রয় নিত। তারা মদিনা মুনাওয়ারা সহ এতদঅঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করছিল।

ইহুদীদের মাতৃভাষা ছিল হিব্রু। হেজাজে এসে তারা ক্রমেই আরবি ভাষা শিখে নিয়েছিল। ফলে তাদের ধর্মীয় কাজে হিব্রু ভাষা ব্যবহার সীমাবদ্ধ রেখে আরবি ভাষায়ই তারা ব্যবহার করত। মদিনা মুনাওয়ারায় ইহুদী ব্যতীত খ্রীষ্টানরাও বসবাস করত।

ইহুদীরা নিজেদের চিরন্তন ধর্মের ও ঐশী বিধানের ধারক বাহক মনে করত। তারা তাদের শিক্ষায়তনে বিভিন্ন ধর্মীয় বিধান ও নবী রসুলের জীবনী পাঠ করত। তারা তাদের ধর্মীয় যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান পৃথকভাবে আদায় বা উদযাপন করত।

এ কথা অস্বীকার করা যাবে না ইহুদীরা শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানগরিমায় এগিয়ে ছিল আরবীয়দের চেয়ে, যদিওবা তাদের চরিত্র হল মোনাফেকী।

ইয়েমেনে তখনকার বিখ্যাত বাঁধ ধ্বংসের পর তথাকার আওস ও খাজরাজ আরবীয় গোত্র মদিনা মুনাওয়ারায় এসে বসতি স্থাপন করে। আওস গোত্রের লোকেরা উত্তর ও পূর্বদিকে এবং খাজরাজ গোত্রের লোকেরা মধ্য ও উত্তর দিকে বসতি গড়ে তোলে। এতে স্বভাবতই আরব ও ইহুদীদের মধ্যে কলহ বিবাদ লেগে থাকত, আবার আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে মাঝেমধ্যে সংঘর্ষ বেধে যেত। আরবীয় আওস ও খাজরাজ গোত্রের বংশীয় আভিজাত্যের স্বীকৃতি মক্কা মুকাররমার কোরাইশরা দিত। এ গোত্রের সঙ্গে কোরাইশদের আত্মীয়তা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের ইতিহাস রয়েছে। তারপরও মক্কা মুকাররমার কুরাইশরা নিজেদেরকে মদিনা মুনাওয়ারার আরব গোত্রদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর মনে করত।

নবী পাক (স.)-র দাদা আবদুল মুত্তালিব, তাঁর পিতা হাশিম ইবনে আবদে মনাফ। আবদুল মুত্তালিবের পিতা হাশিম এর বিয়ে হয় মদিনা মুনাওয়ারার খাজরাজ গোত্রের মেয়ে সালমার সাথে। অর্থাৎ নবী পাক (স.)-এর দাদা আবদুল মোত্তালিবের নানার বাড়ি মদিনা মুনাওয়ারায়। ফলে নবী পাক (স.)-র পিতা আবদুল্লাহ সিরিয়া থেকে মক্কা মুকাররমায় ফিরতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর পিতার নানার বাড়ি বা দাদার শ্বশুরবাড়ি তথা মদিনা মুনাওয়ারায় যাত্রাবিরতি দেন। ঐ অসুস্থাবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বর্তমান রওজা পাকের পশ্চিম সংলগ্ন প্রায় এক শত থেকে দেড়শত মিটার দূরত্বে সমাহিত করা হয়। সম্ভবত ঐ এলাকা সালমার পৈত্রিক তথা পারিবারিক কবরস্থান হবে।

১৯৭৫ সাল পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহর কবরের স্মৃতিচিহ্ন ছিল। বর্তমানে তাঁর এই স্মৃতিচিহ্ন বিলীন করে দেয়া হয়েছে। ইহুদী আরব একই জনপদে অবস্থানের কারণে ইহুদীদের ধর্মীয় অনুভূতি, দিক নির্দেশনাসহ যাবতীয় কিছুতে আরবীয়গণ পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকা স্বাভাবিক। ইহুদীরা বলে বেড়াত তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে, একজন নবী আসবেন এবং নবী আসার সময় অত্যাসন্ন। এমনিতেই নবী পাক (স.) ছোটবেলা আবুতালিবের সঙ্গে সিরিয়া গমন করলে এক খ্রীস্টান পণ্ডিত নবী পাক (স.)-কে দেখে চিনতে পারলে ভবিষ্যতে উনি নবী হবেন বলেন। যেহেতু সাম্প্রতিক সময়ে আগত নবী পাক (স.)-র অবয়ব সম্পর্কে যাবতীয় কথা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মদিনা মুনাওয়ারায় আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে নানান বিষয়ে ভিন্নমত থাকলেও উভয় গোত্র আরবী হিসাবে পরবর্তীতে পুনরায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হত।

নবী পাক (স.) হজ্বের মওসুমে বহিরাগতদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। মদিনা মুনাওয়ারা থেকে আওস ও খাজরাজ গোত্রের কিছুলোক হজ্ব করতে আসলে তাদের কয়েকজন মক্কা মুকাররমার আকাবার নিকট নবী পাক (স.) এর সাথে মিলিত হন। নবী পাক (স.) তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কোরান মজীদের অমিয়বাণী তেলাওয়াত করে শোনান। তাঁরা সংখ্যায় ছিল ছয়জন। উভয় গোত্রের এ সকল লোক মদিনা মুনাওয়ারায় ইহুদীদের প্রতিবেশী ছিল। আলাপচারিতায় ইহুদীরাও স্বীকার করে নিল অল্পদিনের মধ্যে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। পরবর্তী বছর আওস ও খাজরাজ গোত্রের ১২ ব্যক্তি হজ্বের মওসুমে একইস্থান আকাবায় নবী পাক (স.) সাথে মিলিত হয়। তারা নবী পাক (স.)-র হাতে ঈমান এনে চুরি, ব্যভিচার, কন্যাসন্তান হত্যা না করার এবং সৎকার্যে চালিত হওয়ার আনুগত্যে ও তাওহিদ বিষয়ে বায়াত গ্রহণ করে। মদিনা মুনাওয়ারা প্রত্যাবর্তনকালে তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে নবী পাক (স.) তাদের সাথে মুয়াল্লিম হিসেবে হযরত মোছআব (রা.) ইবনে ওমরকে সাথে দেন। মদিনা মুনাওয়ারা পৌঁছে হযরত মোছআব (রা.) ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত দিতে তৎপর হন। এতে মদিনা মুনাওয়ারায় ইসলামের প্রসার লাভ করে।

পরবর্তী বছর হযরত মোছআব (রা.) মক্কা মুকাররমা ফিরে আসলে তাঁর সাথে আনসারগণের একটি কাফেলা ছিল, তাঁদের সংখ্যা ছিল ৭৩ জন। তৎমধ্যে দুইজন মহিলাও ছিল। হজ্বের পর তাঁরা আকাবায় রাত্রিবেলা নবী পাক (স.)-র সাথে মিলিত হন। নবী পাক (স.) তাঁর চাচা হযরত আব্বাছ (রা.) (তখনো তিনি ঈমান আনেন নি) কে সাথে নিয়ে গভীর রাতে আকাবায় পৌঁছেন। নবী পাক (স.) ওয়াদার পর তাঁদেরকে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তা হল তাঁরা নিজেদের পরিবার পরিজনের অনুরূপ নবী পাক (স.)-এর প্রতি মুহাব্বতসহ হেফাজতে সদা তৎপর থাকবেন। আকাবার এ বাইয়াতই ইসলামের ইতিহাসে একটি সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা বলে স্বীকৃত।

আনসারগণের কাফেলা মদিনা মুনাওয়ারা পৌঁছে ইসলামের জোয়ার বইয়ে দেন। মহান আল্লাহপাক তাঁর রসুল ও দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতার জন্য আওস ও খাজরাজ গোত্রকে দাঁড় করিয়ে দেন। এ গোত্র দুটি ইয়াছরেবের প্রধান গোত্র ছিল। এ গোত্রদ্বয় এর লোকেরাই মদিনা মুনাওয়ারাবাসী আনসার সাহাবা হিসাবে গৌরবজনক উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

মানবের স্বভাব চরিত্রে মাটির প্রভাবের প্রতিফলন অস্বীকার করা যাবে না। তেমনিভাবে আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় মক্কা মুকাররমার কুরাইশদের বিপরীত নম্র স্বভাব ও কোমল প্রকৃতির ছিলেন। কঠোরতা, অহঙ্কার, সত্য প্রত্যাখ্যান, ওয়াদা খেলাপের মত নিম্ন স্বভাব হতে তাঁরা ছিলেন পূতপবিত্র। ইহুদীদের সাথে

সহাবস্থানের দরুণ দীনের তাৎপর্য, পরিভাষা, তৌহিদ, রেসালত, আখেরাত সহ ইত্যাদি বহু কিছু পূর্বে থেকে অবহিত থাকার প্রেক্ষিতে তাঁরা দ্রুত ঈমান এনে মদিনা মুনাওয়ারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ভরিয়ে তোলেন।

আকাবার ঐ বাইয়াতের পর থেকে নবী পাক (স.) মক্কা মুকাররমার ছাহাবাগণকে পর্যায়ক্রমে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করতে লাগলেন। কুরাইশগণ এহেন সংবাদ অবহিত হয়ে বাধাদান করতে সচেষ্ট হয়েও ব্যর্থ হতে লাগল। এতে অধিকাংশ ছাহাবী মদিনা মুনাওয়ারা হিজরত করতে সক্ষম হন। শুধুমাত্র নবী পাক (স.) হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (ক.) এবং যে সকল ছাহাবায়ে কেরাম নানাবিধ অপারগতার কারণে হিজরত করতে সক্ষম হননি তাঁরা মক্কা মুকাররমায় থেকে যান। কোরাইশরা বুঝতে পারলেন যে মদিনা মুনাওয়ারা নবী পাক (স.)-এর অনুকূলে শক্ত ভিত সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং মক্কা মুকাররমা থেকে অনেক মুহাজির গিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় আনসারগণের সাথে মিলিত হয়ে যৌথভাবে সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তা উপলব্ধি করতে পেরে মক্কা মুকাররমার কাফেররা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য উদগ্রীব হয়ে পশুর ন্যায় আচরণে তৎপর হল। কাফেররা প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে সাহসী লোক নিয়ে গভীর রাতে নবী পাক (স.)-র গৃহ মোবারকে আক্রমণ চালাতে দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

নবী পাক (স.) আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে অবহিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারার বিপরীত দিকে তথা খানায়ে ক্বাবার দক্ষিণ দিকে জবলে সূ'রে ৩ দিন আত্মগোপন করেছিলেন। কাফেররা গভীর রাতে নবী পাক (স.)র বিছানায় হযরত আলী (ক.)-কে শায়িত পেয়ে ব্যর্থ হয়ে মক্কা মুকাররমায় ব্যাপক তল্লাশী চালায়। এতেও তারা নবী পাক (স.)-কে পেতে ব্যর্থ হয়।

নবী পাক (স.) মক্কা মুকাররমা ত্যাগকালীন হযরত আলী (ক.) কে কিছুদিন তথায় থেকে যেতে বলেছিলেন। এর কয়েকটি কারণের মধ্যে অন্যতম একটি হল মক্কা মুকাররমায় কাফেররা সহ অনেকে নিজেদের কাছে রাখতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে নবী পাক (স.)-এর কাছে নানা প্রকার মূল্যবান ধন সামগ্রী আমানত রাখত। কারণ তাঁর সততা ও আমানতদারীর কথা সর্বজন স্বীকৃত ছিল।

নবী পাক (স.) হিজরত পরবর্তী উক্ত গচ্ছিত আমানতসমূহ যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত আলী (ক.)-কে এ মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন যান।

জবলে সু'রের উক্ত গুহায় ৩ দিন অবস্থানের পর নবী পাক (স.) ১২ রবিউল আউয়াল, ২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ ইংরেজি সোমবার মদিনা মুনাওয়ারার উপকণ্ঠ কু'বা পল্লীতে পৌঁছেন। উক্ত তারিখ হতে ইসলামী বর্ষপঞ্জী হিজরী সনের প্রবর্তন হয়।

অপরদিকে আনসারগণ নবী পাক (স.) মক্কা মুকাররমা হতে হিজরত করার পূর্বাভাস পেয়েছিলেন। তখন থেকে প্রতিদিন মদিনা মুনাওয়ারাবাসী উন্মুক্ত প্রান্তরে

বেরিয়ে নবী পাক (স.)-র আগমনের ব্যাপারে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সাদরে বরণ করার জন্য। সূর্যের উত্তাপ অসহনীয় তথা দ্বিপ্রহর না হওয়া অবধি তাঁরা প্রতীক্ষায় থাকতেন এভাবে। প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে একদিন নবী পাক (স.) কু'বা পল্লীতে শুভাগমন করলেন। মদিনা মুনাওয়ারা থেকে মাত্র ৩/৪ কিলোমিটার দূরত্বে কু'বায় মতান্তরে ১৩/১৪ দিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি তথায় নিজ হস্তে মুক্ত ইসলামের প্রথম মসজিদ "মসজিদে কু'বা" নির্মাণ করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, নবী পাক (স.)-এর নিজ হস্তে নির্মিত ইসলামের উক্ত প্রথম মসজিদ মসজিদে কু'বার বরকতময় নামের অনুকরণে চট্টগ্রাম মহানগরীর জাকির হোসেন রোডস্থ নবপ্রতিষ্ঠিত রোজভ্যালী রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় মসজিদে কু'বা নামকরণে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণে আমার উদ্যোগী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। জানিনা বাংলাদেশের কোথাও এই নামকরণে আরেকটি মসজিদ আছে কি না?

কু'বায় অবস্থানকালীন মসজিদ নির্মাণের পর শুক্রবার সকালে মদিনা মুনাওয়ারা প্রবেশকালীন পথিমধ্যে তিনি জুমার নামাজ পড়েন। যা নবী পাক (স.) কর্তৃক প্রথম জুমার নামাজ। ঐ স্থানে মসজিদ-এ জু'ময়া নামকরণে একটি মসজিদ নির্মিত রয়েছে। নবী পাক (স.) মদিনা মুনাওয়ারা প্রবেশকালীন মদিনা মুনাওয়ারাবাসীগণ যে রকম ভক্তি ও ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে আছে–অলিতে, গলিতে পথে-প্রান্তরে বাড়ি ঘরের ছাদে জানালা ও দরজার সম্মুখে সমবেত হয়ে আল্লাহু আকবর, রসুল (স.)-এর শুভাগমন ইত্যাদি ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে মদিনা মুনাওয়ারাবাসীরা পরম শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন।

মদিনা মুনাওয়ারাবাসী অনেক আনসার তাদের ঘরে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য সশ্রদ্ধচিত্তে উদাত্ত আহ্বান জানাতে থাকলেন। নবী পাক (স.) স্বীয় উষ্ট্রির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমরা একে পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এটির উপর নির্দেশ রয়েছে আমাকে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপরও বারে বারে মদিনা মুনাওয়ারাবাসী এই উষ্ট্রিকে থামাতে লাগলেন নিজেদের ঘরে নবী পাক (স.)-কে স্থায়ীভাবে পাওয়ার আগ্রহে। সবার একই কথা, এয়া রাসুললুল্লাহ (স.) আমাদের কাছে আসুন, আমাদের যা কিছু জনবল সহায়সম্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে তাঁর উপর আস্থা রাখুন। নবী পাক (স.)-র একই কথা, তোমরা উষ্ট্রিকে তার খেয়ালখুশি মাফিক যেতে দাও। কারণ ওর প্রতি আমাকে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা আছে। উষ্ট্রি চলতে চলতে নবী পাক (স.)-র নানাদের পরিবার বনিয়াদী ইবনে নাজ্জায়ের বাড়ীর কাছে এসে উষ্ট্রি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। এখানে উল্লেখ্য, বনিয়াদী ইবনে নাজ্জায়ের মেয়ে ছিলেন নবী পাক (স.)-র দাদা আবদুল মুত্তালিবের আম্মাজান সালমা বিনতে আমর।

নবী পাক (স.) উষ্ঠির পিঠ থেকে নামলেন এবং নিকটস্থ প্রখ্যাত সাহাবা হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর মেহমান হলেন।

প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, ইবনে নাজ্জায়ের বাসস্থানের কাছে এসে উষ্ট্রি যেখানে বসে পড়ল সেখানেই পরবর্তীকালীন মসজিদে নববীর প্রবেশদ্বার তৈরী হয়। তৎকালে উক্ত জায়গাটি ছিল বনু নাজ্জায়ের দুইটি ইয়াতীম শিশুর খেজুর শুকানোর জায়গা।

নবী পাক (স.) হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর ঘরে ৭ মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। এরই মধ্যে তাঁরই দাদার নানার গোত্রের দুই ইয়াতীমদ্বয়ের স্বত্বের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেন। যদিও উক্ত এতিমদ্বয় তাদের স্বত্ব নবী পাক (স.)-র বরাবরে স্বেচ্ছায় দান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

নবী পাক (স.) উক্ত জায়গায় নিজহস্তে শ্রম দিয়ে সাহাবাগণের সহায়তায় মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং সাথে সাথে নিকটস্থ এরিয়ায় তাঁর বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করেন। মদিনা মুনাওয়ারা আগমনের পর জামায়াতের সাথে নামাজ কায়েম এবং আজান প্রথা চালু হয়।

মদিনা মুনাওয়ারায় নবী পাক (স.)-এর আগমন পরবর্তী দ্রুততার সাথে ইসলামের প্রচার প্রসার লাভ করতে থাকে। মাত্র ৭ বছরের ব্যবধানে ২১ রমজান ৬২৯ ইংরেজি নবী পাক (স.) স্বীয় জন্মভূমি মক্কা মুকাররমা বিজয় করেন। মক্কা মুকাররমা বিজয় পরবর্তী জজিরতুল আরব অঘোষিতভাবে নবী পাক (স.)-এর নেতৃত্বে মদিনা মুনাওয়ারার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে বলা যাবে।

এর ২ বছরের ব্যবধানে ৬৩১ ইংরেজিতে নবী পাক (স.) সোয়া লক্ষেরও অধিক সাহাবা নিয়ে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। পরবর্তী বছর ১২ রবিউল আউয়াল ৮ জুন ৬৩২ ইংরেজি নবী পাক (স.) ওফাতপ্রাপ্ত হন। নবী পাক (স.) ইয়াছরিব থেকে মদিনা (মুনাওয়ারা) নামকরণ করে যান।

শানে মদিনা মুনাওয়ারা

উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে বিশ্বের বুকে অতি পবিত্র নগরী হচ্ছে মদিনা মুনাওয়ারা। মক্কা মোকররমা নগরীর যেমনি হেরেম বা সীমানা রয়েছে তেমনি মদিনা মুনাওয়ারারও হেরেম বা সীমানা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হারমের কার্যকারিতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে ইমামগণের মধ্যে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে মদিনা মুনাওয়ারার হারম অর্থে মক্কা মোকররমার হুবহু অর্থ বুঝাবে। যেমন : যুদ্ধ করা, গাছ কাটা, শিকার করা নিষেধ ইত্যাদি মক্কা মোকররমা হারমের মত মদিনা মুনাওয়ারা হারমেও কার্যকর থাকবে। কিন্তু আমাদের ইমাম আবু হানিফা-এর মতে মক্কা মোকররমার মত সম্মানের দিক দিয়ে মদিনা মুনাওয়ারা কোন অংশে কম থাকবে না। কিন্তু মদিনা মুনাওয়ারায় গাছ কাটা, শিকার করা নিষিদ্ধ নয়।

অপরদিকে উপমহাদেশের বিখ্যাত সর্বজনশ্রদ্ধেয় হযরত আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহ.)-এর মতে উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে মক্কা মোকররমা ও মদিনা মুনাওয়ারা নগরী অতি পবিত্রতম। অতঃপর জেরুজালেম নগরী। কিন্তু মক্কা মোকররমা নগরীর চেয়ে মদিনা মুনাওয়ারা নগরী মর্তবাবান। মদিনা মুনাওয়ারা-এর চেয়ে খানায়ে কাবা মর্তবাবান। খানায়ে কাবার চেয়ে রওজাপাক মর্তবাবান। তার মূলে দু'জাহানের সর্দার আল্লাহপাকের প্রিয় হাবীবকে মদিনা মুনাওয়ারার মাটি বুকে ধারণ করে রেখেছে।

১৯০২ সালে বাদশা আবদুল আজীজ কুয়েত থেকে এসে রিয়াদ দখল করার পর ১৯২৪ সালে মক্কা মোকররমা দখল করে নেয়। পরবর্তীতে মদিনা মুনাওয়ারাও দখল করে। কিন্তু বাদশাহ আবদুল আজীজ মক্কা মোকররমা হারমের সীমানাদি যথাযথ সংরক্ষণের গুরুত্ব দিয়ে আসলেও মদিনা মুনাওয়ারা হারমের গুরুত্বকে মনে হয় তারা মেনে নিতে নারাজ। বাদশাহ আবদুল আজীজ ও তার পরিবার মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদীর আকীদা অনুকরণ, অনুসরণ করে থাকে। তাদের আকীদা বিশ্বাস মতে নবী পাক (স.) এর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনা মুনাওয়ারা সফর করা যাবে না। সফর করতে হবে মসজিদে নববীর নামাজের উদ্দেশ্যে। এতে অনায়াসে বুঝা যায় বর্তমান নজদী আকীদা-পন্থী সৌদি রাজপরিবার মদিনা মুনাওয়ারা হারমের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকা স্বাভাবিক। অতএব, মদিনা মুনাওয়ারা হারমের কোন পিলার তথা চিহ্ন নেই। মদিনা মুনাওয়ারা শহর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে হারমের সীমানা পেরিয়ে যায়। এতে করে তথায় অবস্থানকারী

বয়স্কজন থেকে জেনে নেয়া বাদে গত্যন্তর নেই মদিনা মুনাওয়ারা হারমের চিহ্ন কোথায় কোথায় রয়েছে।

হযরত আলী (ক.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন : মদিনা (মুনাওয়ারা) হারম (সম্মানিত) আইর হতে ছাওর পর্যন্ত। যে তাতে অসৎ প্রথা সৃষ্টি করবে বা অসৎ প্রথা সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেবে তার উপর আল্লাহর ফেরেস্তাগণ ও মানুষ সকলেই অভিশাপসহ তার ফরজ বা নফল কিছুই কবুল করা হবে না।

হযরত ছাদ ইবনে আবু ওক্কাছ (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন : আমি মদিনার (মুনাওয়ারা) দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে হারম করছি। তার মধ্যে বৃক্ষ কাটা যাবে না এবং শিকার করা চলবে না। রাসুলুল্লাহ (স.) আরো বলেন : মদিনা (মুনাওয়ারা) তাদের জন্য কল্যাণকর যদি তারা বুঝত। যে ব্যক্তি অনাগ্রহে মদিনা (মুনাওয়ারা) ছেড়ে যাবে তার পরিবর্তে আল্লাহ তার অপেক্ষাও উত্তম ব্যক্তিকে তথায় স্থান দিবেন এবং যে উহার অনটন ও দুঃখকষ্টে ধৈর্যের সাথে টিকে থাকবে কেয়ামতে আমি তার জন্য সুপারিশকারী হব।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন : যখন লোক (সাহাবা) প্রথম ফল লাভ করতেন তখন তা নবী পাক (স.)-এর নিকট নিয়ে আসতেন। তখন তিনি তা গ্রহণ করে বলতেন: আল্লাহ আমাদের ফল-শস্যে বরকত দাও। আমাদের এই শহরের বরকত দাও। আমাদের পরিমাণে ও পরিমাপে বরকত দাও। আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.) তোমার বান্দা, তোমার দোস্ত ও তোমার নবী এবং আমিও তোমার বান্দা ও নবী। তিনি তোমার নিকট মক্কার (মোকররমা) জন্য দোয়া করেছেন আর আমিও তোমার নিকট মদিনার (মুনাওয়ারা) জন্য দোয়া করছি। যেরূপ দোয়া তিনি তোমার নিকট মক্কার (মোকররমা) জন্য করেছেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (স.) নিজ পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ ছেলেকে ডাকতেন এবং তাকে ঐ ফল দান করতেন।

হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: ইব্রাহীম (আ.) মক্কাকে (মোকররমা) সম্মানিত করে তাকে হারম করেছেন। আমি মদিনাকে (মুনাওয়ারা) উহার দুপ্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে সম্মানিত (হারম) করলাম যথাযোগ্য সম্মানে। তাতে রক্তপাত করা চলবে না, যুদ্ধের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করা যাবে না এবং পশুর খাদ্যের জন্য ব্যতীত তাতে কোন গাছের পাতা কাটা যাবে না।

হযরত আয়শা (রা.) বলেন: রাসুলুল্লাহ (স.) মদিনা (মুনাওয়ারা) আগমন করলেন। আমার পিতা আবু বকর (রা.) ও মুয়াজ্জিন বেলাল (রা.) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আমি গিয়ে তাকে এ খবর দিলে তিনি বললেন: আল্লাহ তুমি আমাদের জন্য মদিনাকে (মুনাওয়ারা) প্রিয় কর যেভাবে মক্কা (মোকররমা) আমাদের নিকট প্রিয় অথবা তা অপেক্ষাও অধিক। আল্লাহ তাকে আমাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর কর আমাদের পরিমাণ ও পরিমাপের বরকত দাও।

হযরত ছুফ্য়ান বিন আবু জুহাইর (রা.) বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি: ইয়ামেন বিজিত হবে এবং তথায় মদিনা (মুনাওয়ারা)'র কতক লোক চলে যাবে এবং সাথে তাদের পরিবার ও অনুগামীদেরকেও নিয়ে যাবে। অথচ মদিনা (মুনাওয়ারা) হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম যদি তারা বুঝত। এভাবে শাম বিজিত হবে এবং তথায় কিছু লোক চলে যাবে এবং তাদের পরিবার ও অনুগামীদেরকেও সাথে নিয়ে যাবে। অথচ মদিনা (মুনাওয়ারা) হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম যদি তারা বুঝত। অনুরূপ ইরাক বিজিত হবে এবং তথায় একদল চলে যাবে এবং সাথে আপন পরিবার ও অনুগামীদেরও নিয়ে যাবে অথচ মদিনা (মুনাওয়ারা) হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম যদি তারা বুঝত।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: কেয়ামত কায়েম হবে না যাবৎ মদিনা (মুনাওয়ারা) উহার মন্দ লোকদেরকে দূর করে দেবে, যেভাবে দূর করে দেয় হাপর লোহার খাদকে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন : মদিনার (মুনাওয়ারা) দ্বারসমূহে ফেরেশতাগণ পাহারায় আছে সুতরাং উহাতে প্রবেশ করতে পারবে না মহামারী ও দজ্জাল।

হযরত ছাদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: যে কেউই না মদিনা (মুনাওয়ারা) বাসীর সাথে প্রতারণা করবে সে গলে যাবে, যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।

হযরত আনাছ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: তিনি এই দোয়া করেছেন, আল্লাহ মক্কায় (মোকররমা) তুমি যাহা বরকত দান করেছ মদিনায় (মুনাওয়ারা) তার দ্বিগুণ বরকত দান কর।

তাবেয়ী হযরত ইয়াহ্ইয়া (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: আল্লাহর যমীনে এমন কোন স্থান নেই যাতে আমার কবর হওয়া মদিনা (মুনাওয়ারা) অপেক্ষা আমার নিকট প্রিয়তর হতে পারে। এই কথা তিনি তিনবার বললেন।

বহু হাদিস শরীফ থেকে মাত্র কয়েকটি হাদিস শরীফ সম্মানিত পাঠক মহলে পেশ করলাম, এতে শুধু মদিনা মুনাওয়ারার উপর হাদিস শরীফ। নবী (স.)-এর যেয়ারতের উপর হাদিস শরীফ এখানে পেশ করা হয়নি।

মদিনা মুনাওয়ারার সাবেক নাম ইয়াসরির। অর্থ তিরস্কার। নবী পাক (স.) নামকরণ করেন মদিনা (মুনাওয়ারা)। যার অর্থ মহানগরী। কিন্তু মহান আল্লাহপাক নামকরণ করেন "তাবা' যার অর্থ পবিত্র।

মক্কা মোকররমা নগরী নবী পাক (স.)-এর জন্মস্থান। প্রায় প্রত্যেক নবী, রসুল তথায় এসেছেন, হজ্ব করেছেন, দোয়া করেছেন, তবে নবী পাক (স.) মক্কা মোকাররমার প্রতি ভালবাসার কোন কমতি ছিল বলা যাবে না। কিন্তু নানান দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে পরিস্কার হয়ে যায় যে, নবী পাক (স.) মক্কা মোকররমার

চেয়ে মদিনা মুনাওয়ারাকে অত্যধিক ভালবাসতেন। কাজেই তিনি মক্কা মোকররমা বিজয়ের পর মদিনা মুনাওয়ারা চলে যাওয়া এবং তথায় থেকে যাওয়াকে বেছে নিয়েছিলেন। জেরুজালেমের মসজিদে আকসা মক্কা মোকররমায় খানায়ে কাবার কারণে বিশেষ মর্তবাবান। কিন্তু মদিনা মুনাওয়ারা তার চেয়ে বেশি মর্তবাবান হওয়ার মূলে নবী পাক (স.) স্বয়ং তথায় শায়িত। মসজিদে নববীর কারণে নয়, স্বয়ং নবী পাক (স.) শায়িত হওয়ার কারণে। আল্লাহর অতি প্রিয় হাবীব যে মাটিতে শায়িত সে রওজাপাক আল্লাহ পাকের খাস অবস্থানবাদে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অতি পবিত্রতম স্থান এবং এতে করে মদিনা মুনাওয়ারা বিশ্বের বুকে বিশেষ সম্মানের অধিকারী।

অতএব, যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করলে তথাকার প্রধান দাবী হল তাজিম রক্ষায় সচেষ্ট থাকা। বহু ইমাম-গাউস-কুতুব মদিনা মুনাওয়ারায় বেয়াদবীর ভয়ে প্রশ্রাব-পায়খানা পর্যন্ত করেন নি। বহু ইমাম-গাউস-কুতুব খালি পায়ে মদিনা মুনাওয়ারা অবস্থান করেছেন। বহু ইমাম গাউস কুতুব হামাগুড়ি দিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করেছেন তাজিম রক্ষার্থে বা বেয়াদবীর ভয়ে। একালে আমরা মদিনা মুনাওয়ারায় গমন করে কতটুকু তাজিম রক্ষা করেছি ভাবতে হবে।

যেয়ারতে রওজাপাক

মহান আল্লাহপাক তাঁর উছিলায় ও নূরে আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, মহাসমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, জ্বিন-পরী, ফেরেশতা ও মানবজাতিসহ যাবতীয় সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরের সর্দার ও শ্রেষ্ঠ মানবরূপে সকলের শেষে পৃথিবীতে আমাদেরকে পাপ-পুণ্যের পার্থক্য শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে এবং যাঁর মাধ্যমে পবিত্র কোরআন মজিদ নাজিল করেছেন, ইহকাল ও পরকালের পরিত্রাণের জন্য যাঁকে শফিউল মুজনেবীন উপাধি প্রদান করা হয়েছে সে– হাবিবে খোদা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদিনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে মানবের সাধারণ দৃষ্টির অগোচরে শায়িত আছেন।

উম্মতে মোহাম্মদীর সারাজীবনের সর্বোচ্চ পাওনা হল মদিনা মুনাওয়ারা গমন ও নবী পাকর যেয়ারত লাভ তথা রওজা পাক হাজিরা দিয়ে নবী পাকর কদমে সশ্রদ্ধ সালাম পেশ করা। সারাজীবনের মধ্যে এর চেয়ে মহামূল্যবান নিয়ামত উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য আছে বলে মনে করি না। এ নেয়ামত পাওয়ার জন্য মুসলমানগণ মহান আল্লাহপাকের দরবারে আকুতি মিনতি করে দোয়া করে থাকেন, যাতে করে সারাজীবনে একবার হলেও মদিনা মুনাওয়ারায় নবী পাকর কদমে হাজিরা নছিব হয়। ইসলামের ইতিহাসে বিশ্বখ্যাত বহু ইমাম, পীর ও ওলামা মদিনা মুনাওয়ারার শান ও যেয়ারতের মর্তবার কথা বলে গেছেন। তেমনিভাবে বলে গেছেন মদিনা মুনাওয়ারার তাজিমের কথা। আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রহ.); মতান্তরে অন্য ইমাম মদিনা মুনাওয়ারায় তিন দিনের বেশি অবস্থান করতে পারেন নি, যেহেতু তিনি মদিনা মুনাওয়ারার মাটিতে প্রশ্রাব-পায়খানা করতে সাহস করেন নি বেয়াদবীর ভয়ে। এমন ইমাম, অলি, দরবেশ রয়েছেন যাঁরা জুতা, সেন্ডেল পায়ে দিয়ে হেঁটে মদিনা মুনাওয়ারা প্রবেশ না করে হামাগুড়ি দিয়ে মদিনা মুনাওয়ারা প্রবেশ করেছেন আদব রক্ষার্থে। ইমাম মালেক (রহ.) মদিনা মুনাওয়ারায় মৃত্যু পাবার লোভে জীবনে মাত্র একবার হজ্ব করেছেন এবং মদিনা মুনাওয়ারার বাইরে জরুরী প্রয়োজনে গেলে দ্রুত ফিরে আসতেন। আল্লাহ না করুক মদিনা মুনাওয়ারার বাইরে মৃত্যু ঘটতে পারে এই ভয় তাঁকে তাড়িত করছিল। বিশ্বখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ কিতাবে লিখে গেছেন, নবী পাকের কদমে যতবারই সালাম পেশ করা হোক না কেন মাত্র একবার যদি জওয়াব পাওয়া যায় তবে জীবন ধন্য মনে করতে হবে। প্রখ্যাত আলেম হযরতুল আল্লামা আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ "জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব" গ্রন্থে বলেছেন,

মক্কা মোকররমা শহর থেকে মদিনা মুনাওয়ারা শহর মর্তবাবান। মদিনা মুনাওয়ারা শহর থেকে খানায়ে ক্বাবা মর্তবাবান। খানায়ে ক্বাবা থেকে রওজা পাক মর্তবাবান। অর্থাৎ নবী পাককে যে মাটি ধারণ করে আছে তার মর্তাবা মহান আল্লাহপাকের সারা মাখলুকাতে সর্বোচ্চ মর্তবার স্থান। অনেক বুজুর্গানেদ্বীন মন্তব্য করে গেছেন, মদিনা মুনাওয়ারার স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া বাইরের কেউ যাতে মদিনা মুনাওয়ারায় বসবাস না করে এবং যেয়ারতের উদ্দেশ্যে অবস্থানের পর নিজ গন্তব্যে যেন ফিরে আসে। যেহেতু মদিনা মুনাওয়ারার স্থায়ী বাসিন্দার পারিপার্শ্বিক অবস্থা গ্রহণযোগ্য ও বিবেচিত। কিন্তু বাইরের কারও এদিক-সেদিক হলে তার পরিণতি ভয়াবহ। মহানবী (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর যেয়ারত করল তার জন্য সুপারিশ আমার জন্য ওয়াজিব হল। নবী পাক আরও বলেছেন, আমার ওফাতের পর যে ব্যক্তি আমার যেয়ারত করবে সে যেন জীবিত অবস্থায়ই আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। নবী পাক বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্ব করল অথচ আমার যেয়ারত করল না সে যেন আমার সাথে বেয়াদবী করল।

অতএব, নবী পাকের যেয়ারতের সৌভাগ্য যার হয় তিনি যে একজন অতি ভাগ্যবান তাতে কোন সন্দেহ নাই। এমনিতে শারীরিক ও মানসিক একটা উপলব্ধি মদিনা মুনাওয়ারায় পরিলক্ষিত হয়। মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে শরীরে নূরানী পরিবেশ, নম্রতা, ভদ্রতা উপলব্ধি করা যায়।

আমাদের দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কয়েক নিয়তে উম্মতে মোহাম্মদীগণ মদিনা মুনাওয়ারা গমন করে থাকেন। তৎমধ্যে সর্বোত্তম নিয়ত হল শুধুমাত্র যেয়ারত তথা মদিনা মুনাওয়ারায় নবী পাকের কদমে সালাম পেশ করতে গমন করা। অন্যান্য নিয়তের লোকও কম নয়। টাকা কামাইয়ের উদ্দেশ্যে মদিনা মুনাওয়ারা গমন করা, মসজিদ, মাদ্‌রাসা তথা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চাঁদার জন্য মদিনা মুনাওয়ারা গমন করা, লেখাপড়া করার জন্য মদিনা মুনাওয়ারা গমন করা ইত্যাদি। নবী পাকের যেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমনের দুটি শর্ত আছে বলে মনে করি: (১) হালাল টাকা খরচ করে মদিনা মুনাওয়ারা গমন করা চাই। বর্তমানকালে শতকরা কয়জনের টাকা হালাল বলা মুশকিল। অতএব, হালাল টাকার ব্যাপারে সজাগ থাকা চাই। (২) নিয়ত স্বচ্ছ থাকা তথা শুধু যেয়ারত ছাড়া মনমানসিকতায় অন্য কিছু না আনা চাই।

মদিনা মুনাওয়ারার মূল হুদুদ (সীমানা) পিলার দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা দরকার। বর্তমানকালে শহরের পরিধি বেড়ে গিয়ে মূল মদিনা মুনাওয়ারার সীমানার বাইরে চলে গেছে। ফলে রাস্তা অনুমান ভিত্তিতে বুঝে নিতে হয়। সৌদি সরকারকে এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারীরা নবী পাকের যেয়ারত নিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে এবং এ নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় কোটি কোটি পুস্তক প্রকাশ করে থাকলেও মুসলিম বিশ্বসহ আমাদের এ উপমহাদেশের সব আক্বিদার বিখ্যাত

ইসলামী ব্যক্তিত্বগণ শুধুমাত্র নবী পাকের যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা তথা মদিনা মুনাওয়ারা গমন করা শরীয়তসম্মত, গ্রহণযোগ্য ও পুণ্যময় সফর বলে বারেবারে বলে গেছেন। বর্তমানেও বলে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, উপমহাদেশের এসব ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ প্রায় চল্লিশ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আমি নগণ্য আহমদুল ইসলাম মদিনা মুনাওয়ারা গমন করি নবী পাকের কদমে হাজিরা দিতে, সালাম পেশ করতে। সেই সুযোগে মসজিদে নববীতে জামাতে নামাজ পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকি। যেখানে দু'জাহানের সর্দার মহান আল্লাহ পাকের অতি প্রিয় হাবিব শায়িত, যাঁর উছিলায় পরকালের নাজাত তাঁকে যেয়ারতের নিয়ত আগে না রেখে মসজিদে নদবীর নামাজের নিয়তকে আগে রাখব তা হতে পারে না। মহান আল্লাহপাক তাঁর হাবিবের উম্মতগণকে নিয়তে স্বচ্ছ থাকার ও বারেবারে নবী পাকর যেয়ারত লাভের সৌভাগ্য দান করুন। আমিন।

নবী পাকের প্রতি মহব্বতের পরিধি

যার মনে নবী পাকের প্রতি মহব্বত নেই তাকে মুসলমান গণ্য করা যাবে কি না বলা মুশকিল। নবী পাকের প্রতি মহব্বত দেখাতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন আক্বিদার লোক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে। কেহ মনে করে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম কায়েম করা নবী পাকের আদর্শ। অতএব, এ পথে থাকা শ্রেষ্ঠ মহব্বত। কেহ মনে করে দ্বীন প্রচারের জন্য ঘর-বাড়ি ছেড়ে একালেও মুসলিম দেশে সফর করা শ্রেষ্ঠ আদর্শ। অতএব, এ পথে থাকা শ্রেষ্ঠ মহব্বত। অনেকে নবী পাকের শানে মিলাদ মাহফিল, জুলুস, গরু ছাগল জবেহ করাকে অন্যতম পুণ্যের কাজ মনে করে। অতএব, এ পথে থাকাটা শ্রেষ্ঠ মহব্বত।

আমাদের দেশে নবী পাকের শানে মহব্বতের ব্যাপারে মনে হয় কারো দ্বিমত নেই। তবে মহব্বত পালন নিয়ে চরম দ্বিমত রয়েছে। এক আকিদার লোকজন অন্য আকিদার লোকজনের প্রদর্শিত মহব্বতকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে থাকে। এখন প্রশ্ন হল, নবী পাকের প্রতি মহব্বতের পরিধি কত, তার সীমারেখা কতটুকু এবং কি রকম। আমি একজন অতি নগণ্য উম্মত হয়ে যে বিশ্লেষণ পেশ করব তা হল, কে বলছেন সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে কি বলতেছেন সেদিকে দৃষ্টি দিতে সবিনয় অনুরোধ করছি।

নবী পাকের প্রতি মহব্বতের পরিধি নেই। যার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে মহব্বত দেখাতে পারেন। মহব্বত দেখানোর কোন সীমারেখা বা নিয়মনীতি নেই। এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণই যথেষ্ট। আর তা হল হযরত ওয়াইস করণী (রা.)-এর মহব্বত। তিনি নবী পাককে না দেখেও শোনা কথায় মহব্বত দেখাতে গিয়ে নিজের সমস্ত দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। রক্ত ও প্রস্রাব নাপাক। কিন্তু মহব্বতের কারণে নবী পাকের রক্ত ও প্রস্রাব পান করেছিলেন ছাহাবা কেরাম। নবী পাকের কানে যাওয়ার পর নাখোশ হওয়া মনে করা স্বাভাবিক ছিল। যেহেতু দাঁত আল্লাহপাকের নেয়ামত। আল্লাহপাক আমাদেরকে তথা মানবজাতিকে অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় দাঁত দিয়েছেন অতি প্রয়োজনের কারণে। কিন্তু সে দাঁত ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে ফেলা মহান আল্লাহপাকের না-শোকরি করা নয় কি? এবং নিজের প্রতি জুলুম নয় কি? কিন্তু নবী পাকের প্রতি মহব্বত দেখাতে এ জুলুম নবী পাকের প্রতি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। নবী পাক ওয়াইস করণীর প্রতি খুশি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে দু'জন আমিরুল মোমেনিন বাহক হয় নবী পাকের হাদিয়া বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন হযরত ওয়াইস করণীর কাছে। নবী পাকের জীবদ্দশায় এর চেয়ে মহব্বতের বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে? এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী পাকের

প্রতি মহব্বত দেখাতে কোন পরিধি তথা সীমারেখা নেই। তবে মহব্বত দেখাতে গিয়ে শরীয়তের দিকনির্দেশনা মেনে চলতে হবে। অপরদিকে, মহব্বত দেখাতে গিয়ে যাতে পবিত্রতায় ঘাটতি না থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। অনেকে নবী পাকের প্রতি মহব্বত প্রদর্শন করতে গিয়ে এবং আদর্শ অনুকরণ করতে গিয়ে জীবনটাকে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত রেখেছে। কিন্তু তার আয়ের উৎসের কোন খবর নেই অর্থাৎ ব্যয় দেখা যায় প্রচুর কিন্তু আয় কোথা থেকে আসে তা জানা যায় না। অনেকে নবী পাকের প্রতি মহব্বত দেখাতে গিয়ে ঘর-বাড়ি, স্ত্রী, পুত্রজন ছেড়ে নিরুদ্দেশে চলে যায়। কিন্তু তার জীবনটা কিভাবে কেটেছিল, কত টাকা হারাম, ঘুষ, সুদে আয় হয়েছিল তার খবর রাখে না। তার নির্মিত ঘর বৈধ আয়ের কি না তা খতিয়ে দেখেনা। অতএব, আগে গোড়া ঠিক করতে হবে তারপর অতি পুণ্যের আশায় সফর করা চাই।

মহান রবিউল আউয়াল মাসে অনেকে নবী পাকের প্রতি মহব্বতে মিলাদ পড়াবে, জুলুস বের করবে, গরু ছাগল জবেহ করে মানুষকে খাওয়াবে। এমন কিছু যে নবী পাকের শানে মহব্বত প্রকাশের জন্য গ্রহণযোগ্য তাতে ইতস্ততার কোন কারণ আছে বলে মন করি না। যদি হযরত ওয়াইস করণী এর নিজের দাঁতকে ভেঙ্গে ফেলা মহব্বত হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে তবে মামুলী মহব্বত মিলাদ, জুলুস, গরু জবেহ অগ্রহণযোগ্য হবার কোন কারণ দেখি না। বরং এর চাইতে বহুগুণ বেশি করলেও তাও মহব্বতের পরিধির মধ্যে। এগুলোকে নবী পাকের শানে মহব্বতের অপপ্রয়োগ বলে কোন কারণ খুঁজে পাই না। শুধু তাই নয়, শাহী জামে মসজিদের খতিব বা প্রখ্যাত পীর সাহেব বা বিখ্যাত মুফতি বা মোহাদ্দেস সাহেব যদি শহরের ব্যস্ততম রাস্তা দিয়ে শুধু লুঙ্গিটা রেখে কোর্তা, গেঞ্জি ও টুপি ছাড়া ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে বলে মহব্বতের উপর দৌড়াতে থাকেন তাতেও নবী পাকের প্রতি মহব্বতের সীমা লঙ্ঘিত হবে বলে মনে করি না। অর্থাৎ নবী পাকের প্রতি মহব্বতের কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। নবী পাকের প্রতি মহব্বত দেখাতে গিয়ে পবিত্রতা লঙ্ঘিত হতে পারবেনা। কিন্তু বর্তমান কালে পবিত্রতা রক্ষা করে ক'জনই নবী পাকের প্রতি মহব্বত দেখায় বলা মুশকিল। যেমন গভীর রাতে মিলাদ মাহফিলের মাইক হাজার হাজার নর-নারীর ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে থাকে; এভাবে মিলাদ পড়ানো কোন্ ধরণের মহব্বত বুঝে আসে না। যেখানে সেখানে ওজু আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য না রেখে মিলাদ পড়ানো, দাঁড়িয়ে ছালাম পেশ করা নবী পাকের প্রতি মহব্বত হতে পারেনা। মিলাদ, ছালাম পেশ করতে সকলের ওজুসহ ভাবগম্ভীর পরিবেশ বজায় থাকে মত চাই। জুলুস বেশি বেশি করা চাই মহব্বতের উপর কিন্তু ওজু থাকতে হবে। নামাজ কাযা করা যাবে না। ওজু আছে কি না খবর নেই, জোহরের নামাজ পড়া হল কি না খবর নেই। অথচ জুলুস নিয়ে মাতোয়ারা হলাম–একি মহব্বত হতে পারে? গরু জবেহ করে খাওয়ালাম কিন্তু নামাজের খবর নেই। নবী পাকের মহব্বতের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে নামাজ। নামাজ বাদ দিয়ে কোন কিছু করা মহব্বত হতে পারে না।

অপরদিকে, মিলাদ, জুলুস, গরু-ছাগল জবেহ–এসব কিছুতে হালাল টাকা থাকা চাই। সুদের টাকা, ঘুষের টাকা এবং পরের হকের টাকা দিয়ে মিলাদ, জুলুস ও গরু-ছাগল জবেহ করা হলে তা মহব্বত তো নয়ই বরং নবী পাকর শানে চরম বেয়াদবি বলে মনে করি।

কাজেই আমাদেরকে ভাবতে হবে, গবেষণা করতে হবে নবী পাকের প্রতি মহব্বতের সীমারেখা কতটুকু এবং কি কি। নবী পাকের প্রতি মহব্বত দেখাতে গিয়ে যাতে কোন অবস্থাতে শরীয়ত লঙ্ঘিত না হয়, নামাজ কাযা না হয়, বে-অজু না হয় এবং হারাম টাকা খরচ না হয় তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

মদিনা মুনাওয়ারায় মিলাদ মাহফিল

গত হজ্বের (২০০৭) আগে মদিনা মুনাওয়ারায় নবী পাক (স.) শানে এক মোবারক মাহফিলে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়। হজ্বের আগে মক্কা মুকাররমায় সাপ্তাহখানেক অবস্থান করে মদিনা মুনাওয়ারা গমন করি। তথায় ৫/৬ দিন অবস্থানের পর হযরত ড. রিদোয়ান সাহেবকে ফোন করি। তিনি মদিনা মুনাওয়ারাবাসী অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব। ফোনে আলাপান্তে তিনি আমাকে একদিন পর বৃহস্পতিবার বাদ এশা তাঁরই ঘরে নবী পাকের (স.) শানে মাহফিলে যোগদান করার জন্য দাওয়াত দেন। আমি নিশ্চয়তা প্রদান করিনি যেহেতু তাঁর ঘরে ইতিপূর্বেও একবার এক মিলাদ মাহফিলে গিয়েছিলাম। ১৪ ডিসেম্বর শুক্রবার বাদ জুমা মক্কা মুকাররমা রওয়ান হতে হবে। অতএব, যাব কি যাব না এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি। এমনি অবস্থায় ১৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এশার নামাজের পরপর এক অজ্ঞাত উর্দুভাষী ফোন করে। তিনি আমাকে হযরত ড. রিদোয়ান সাহেবের বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন। এতে মনে হয় হযরত ড. রিদোয়ান সাহেব তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমার মনে ইতঃস্ততা থাকলেও ডক্টর সাহেবের আগ্রহ ও আন্তরিকতা উপলব্দি করে আমি উক্ত উর্দু ভাষীকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার নির্ধারিত স্থানে আসার কথা বলি।

মুলতঃ হযরত ড. রিদোয়ান তথাকার জামেয়া তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, সৌদি আরবের অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। বয়স ৬০-এর কোটায়। তাঁর আলীশান ঘরের নিচ তলায় উক্ত মোবারক মাহফিলে অংশগ্রহণ করেছিলাম গত বছর হজ্বের আগে।

তাঁর বাড়ী রওজা পাকের ২/৩ কিলোমিটার পূর্বদিকে। কাজেই রাত্রে টেক্সী যোগে তাঁর বাড়ীর অবস্থান নির্ণয় করা আমার জন্য সহজতর হবেনা ভেবে তিনি এই উর্দুভাষীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর নাম মোহাম্মদ ইকবাল। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মদিনা মুনাওয়ারা প্রবাসী। ১৫/২০ মিনিটের ব্যবধানে তিনি এসে তার নিজস্ব গাড়ীতে আমাকে তুলে নিয়ে হযরত ড. রিদোয়ানের বাসভবনে চলে যায়। মোহাম্মদ ইকবাল গাড়ি পার্ক করে আমাকে সাথে নিয়ে উপর তলার দিকে যেতে আমি হতচকিত হই। যেহেতু গতবারের মাহফিলে অংশগ্রহণ করেছিলাম নিচতলার ড্রইং রুমে। উপর তলায় উঠে প্রথমে আমাকে একটি বৃহদাকারের বৈঠকখানায় উপবেশন করা হল। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ইকবাল সাহেব আমাকে মূল মাহফিল কক্ষে নিয়ে যান। দেখলাম বিশাল নয়নাভিরাম কক্ষ চতুষ্পার্শ্বে

শানদার সোফা পাতানো, মেঝেতে চকচকে তকতকে মূল্যবান কার্পেট; এ কক্ষটিতে সোফা ও মেঝেতে প্রায় শ'খানেক লোক বসার আয়োজন রয়েছে।

রাত ৯টার দিকে আমি প্রবেশকালীন ১৫/২০ জন মদিনা মুনাওয়ারাবাসী সোফায় বসে কোরআন মজীদ তেলাওয়াতে রত। আমাকে প্রথমে গাহওয়া অতপর দুধবিহীন চা দিয়ে আপ্যায়ন করল। সাথে সাথে আগত মেহমানদেরকেও আপ্যায়ন করছেন। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে সমাগম বেড়ে সোফাগুলো ভরপুর হয়ে মেঝেতেও উপবেশন শুরু হয়ে যায়। অতপর একপার্শ্বে মাইকের মাধ্যমে জনৈক মদিনা মুনাওয়ারাবাসী মাহফিলের কার্যক্রম আরম্ভ করে দেন। তিনি আরবীতে ছাপানো একটি দরূদ শরীফের কিতাব নিয়ে সুললিত কণ্ঠে দরূদ শরীফ পাঠ আরম্ভ করে দেন। তিনি যতবার নবী পাক (স.) নাম "মোহাম্মদ (স.)" উচ্চারণ করছেন ততবারেই নামের পূর্বে সৈয়দেনা উল্লেখ করেছেন।

তিনি প্রায় ঘন্টাখানেক সময় নিয়ে মধুর কণ্ঠে নানান ভঙ্গিমায় নানারকম মোবারক দরূদ শরীফ পাঠ করছিলেন। এ ঘন্টাখানেকের মধ্যে তিনি কম করে হলে শতবারের মত নবী পাক (স.) মোবারক নাম নেন। কিন্তু একবারে জন্যও নবী পাক (স.) নামের পূর্বে "সৈয়দেনা" উচ্চারণ করতে ভুল হয়নি।

ঘন্টাখানেক পর আরেক মদিনা মুনাওয়ারাবাসী মাইক নিয়ে দরূদ শরীফ পড়তে শুরু করে দেন। লক্ষ্য করলাম তিনিও নবী পাক (স.)-র নাম নেয়ার আগে "সৈয়দেনা" বলতেছেন। এরই মধ্যে হযরত ড. রিদোয়ান মাহফিলে তশরীফ আনেন; এরিই মধ্যে সমাগম বাড়তে বাড়তে পার্শ্ববর্তী বৈঠকখানায়ও সম্প্রসারিত হয়।

গতবার উপলব্দি করতে না পারলেও আজকে স্পষ্টতই বুঝতে পারলাম দ্বিতল বিশিষ্ট বিশাল সুরম্য প্রসাদের নিচতলায় তাঁর পারিবারিক আবাসস্থল, উপরতলা পুরোটাই তাঁর মাহফিল সমাবেশের জন্য নির্ধারিত বলা যায়। সে লক্ষে একপার্শ্বে বিশাল মাহফিলগাহ্ মিলনায়তন, তার সম্মুখ পানে ২০/৩০ জন উপবেশন করতে পারে মত বৈঠকখানা রয়েছে। দুই কক্ষের মধ্যবর্তী করিডোর টয়লেট ওয়ালবক্স থাক ইত্যাদি আধুনিক সুযোগ সুবিধায় ভরপুর দেখতে পেলাম।

রাত ৯-৩০ ঘটিকার পর ড. রিদোয়ান সাহেব মাহফিলে দাঁড়ানোর সাথে সাথে সবাই দন্ডায়মান হয়ে যায়। সাথে সাথে তিনি মারহাবা মারহাবা সুর করে নবী পাক (স.)-র শানে কেয়ামের মাধ্যমে সালত সালাম দেখা শুরু করেছেন। সাথে সাথে তাঁর পার্শ্ববর্তী সহযোগী ২/৩ জন মদিনা মুনাওয়ারাবাসী তাকে সহযোগিতা করেন। আমরা সমবেত সকলে গভীর আবেগের সহিত অনুকরণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে ছিলাম। ৩/৪ মিনিটের ব্যবধানে আমাদের দেশের মত "ইয়া নবি সালাম আলাইকা---" সুরে সালাত সালাম দেওয়া শুরু করেছেন এবং সাথে সাথে উক্ত সালামের সুরের সাথে আমাদের দেশে প্রচলিত ৩/৪টি সালাত সালামের আরবী বয়াত তথা আরবী কাব্য পাঠ করা হয়। প্রায় ৭/৮ মিনিটব্যাপী এ কেয়াম

তথা দাঁড়িয়ে সালাত সালাম প্রকৃতই আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। যেহেতু মদিনা মুনাওয়ারা পাক জমিনে, মদিনা মুনাওয়ারাবাসীগণ কর্তৃক পরিচালিত নবী পাক (স.) শানে এ রকম একটি হৃদয়গ্রাহী আজিমুশ্‌শান মনোমুগ্ধকর মোবারক মাহফিল সাথে সাথে কেয়াম তথা দাঁড়িয়ে সালাত সালামের স্বর্গীয় আমেজে আমাকে আবেগে আপ্লুত করে ফেলে।

অতপর হযরত ড. রিদোয়ান সাহেব হাত তুলে উচ্চস্বরে আরবীতে মুনাজাত পরিচালনা করেন। তাঁর এই মুনাজাতে লক্ষ্য করলাম, আল্লাহপাকের দরবারে অন্যান্য দুনিয়াবী আবেদনের চেয়ে নবী পাক (স.)-এর শাফায়াত তথা সুপারিশই চেয়েছিলেন অত্যাধিক। তাঁর এই আবেগ প্রবণ মুনাজাতে কান্নার রোল পড়ে যায়। রাত ১১টার পরপর মাহফিল সমাপ্ত হয়।

নবী পাক (স.)-র শানে এ মোবারক মাহফিলে কিছু উর্দু ভাষীও ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের মনে হয় আমিই একজন। মাহফিলের পরপর প্রথমে প্লেট করে ঝাল ও মিষ্টান্ন নাস্তা সরবরাহ করা হয়। অতঃপর বড় বড় (গোল ট্রে) থালা করে আরবীয় রান্না ছাগল/দুব্বার পোলাউ, সাথে দধি মিশ্রিত সালাদ।

পরদিন জুমার পর মক্কা মুকাররমা রওয়ানা হতে হবেবিদায় সে লক্ষ্য নিদ্রাযাপনের জন্য কালবিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি চলতে যেতে তৎপর ছিলাম। এতে ড. রিদোয়ান সাহেব একটু অপ্রস্তুত হন। যেহেতু তারই গাড়িযোগে গতবার আমার গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

তাকে পুনঃ সে সুযোগ না দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এসে দেখি তাঁর বাড়ির সম্মুখস্থলে মাহফিলে আগতগণের অসংখ্য গাড়ি, তথা হতে এক মদিনা মুনাওয়ারাবাসী নিজ গাড়ি নিয়ে চলে যাওয়া কালীন আমাকে লক্ষ্য করে তার পার্শ্বে তুলে নেন। গাড়ি চলাকালীন আমি তাকে বললাম আপনি আল্লাহর রাসূল (স.)-র প্রতিবেশী আমি আল্লাহর রাসূল (স.)-র মেহমান। এতে তিনি মারহাবা মারহাবা বলে আমাকে মোবারকবাদ জানান। তিনি মসজিদে নববী (স.)-র অনতি দূরত্বে আম

যেয়ারতে শহীদাইনে বদর ও মা আমেনা

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হল বদরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ১৪ জন মহান শহীদদের যেমনি বিশেষ মর্যাদার কথা বলা আছে তেমনি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবার বিশেষ মর্যাদার কথাও উল্লিখিত রয়েছে।

মদিনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় ১৫০ কি.মি. মক্কা মোকররমার পথে বদর। ১৯৮৪ সাল থেকে বর্তমান ৬ লেইনের উভয়মুখী রাস্তা চালু হওয়ার আগে সাবেক রাস্তা বদরের পাশ দিয়ে ছিল। ফলে সে সময় বাস বা গাড়ি থামিয়ে হজ্ব, ওমরাহ্ যেয়ারতকারীগণের অনায়াসে বদরের শহীদাইনের যেয়ারত করতে সুবিধা হত। কিন্তু ১৯৮৪ সাল থেকে নতুন ৬ লেইনের বৃহদাকারের রাস্তা বদরের দূর দিয়ে চালু হওয়ায় মদিনা মুনাওয়ারায় যাওয়া-আসার পথে বদরের শহীদাইনের যেয়ারত থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে।

অপরদিকে, বদর থেকে আরো প্রায় ১০০ কি.মি. মক্কা মোকররমার পথে আবওয়া নামক পাহাড়ি এলাকায় হযরত সৈয়েদানা মা আমেনা চিরনিদ্রায় শায়িত।

ছাত্রজীবন থেকে মক্কা মোকররমা ও মদিনা মুনাওয়ার মধ্যখানে মা আমেনার পবিত্র কবর রয়েছে বলে বারে বারে জেনে আসছিলাম। সাথে সাথে বদরের যুদ্ধ ও শহীদাইনের কথা জানা থাকাও স্বাভাবিক। ১৯৮৪ সালের আগে মদিনা মুনাওয়ারা গমনকালে বারেবারে বদরের শহীদাইনের যেয়ারতের সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর বদরের শহীদাইনের যেয়ারত থেকে বঞ্চিত ছিলাম। অপরদিকে, হযরত সৈয়েদানা আমেনার যেয়ারতে যাওয়ার একান্ত আগ্রহ থেকেও সৌদি কড়া আইনের কারণে সম্ভবপর হচ্ছিল না। অর্থাৎ হজ্ব, ওমরাহ্ যেয়ারতকারীগণ মক্কা মোকররমা ও মদিনা মুনাওয়ারার শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে সৌদি রাজতন্ত্রের আইনে নিষেধ। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জেদ্দা যাওয়া যাবে। এতে মা আমেনার যেয়ারত নয়ই এমনকি বদর যেয়ারতে যাওয়ারও সুযোগ হচ্ছিল না।

গত রমজানের (২০০৫ সালে) শেষপক্ষে মদিনা মুনাওয়ারা অবস্থানকালে দেশীয় এলাকার হাফেজ হায়দার আলীর মাধ্যমে পরিচয় হয় অপর দেশীয় এলাকার মাওলানা হারুন-এর সাথে। আমাদের বাড়ির প্রায় ৩ কি.মি. পশ্চিমে তার বাড়ি। মদিনা মুনাওয়ারায় ঠিকাদারী করে টাকা রোজগার করে ভাল অবস্থানে আছেন। অপরদিকে মাওলানা হারুন দূর-দুরান্তে গিয়ে যেয়ারতের পক্ষের লোক।

একদিন কথা প্রসঙ্গে মাওলানা হারুনকে আমার বদর ও আবওয়া যেয়ারতে যাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করলাম। এতে মাওলানা হারুন অতি উৎসাহী হয়ে ঈদের

পরদিন আমিসহ যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি দীর্ঘদিন মদিনা মুনাওয়ারা থাকলেও আবওয়া ত নয়ই এমনকি বদর পর্যন্ত যেয়ারতে যাননি। আমরা হজ্ব, ওমরাহ্ যেয়ারতকারীগণের গতিবিধিতে সৌদি বিধিনিষেধ থাকলেও একামাওয়ালাদের গতিবিধিতে কিছুটা শিথিল করা হয়েছে গত বছর থেকে।

আমার এতেকাফে থাকা অবস্থায় মাওলানা হারুন হাফেজ হায়দর আলীসহ খোঁজ খবর এর পাশাপাশি খুশী মনে আশ্বস্ত করতে থাকেন যে বদরের পাশাপাশি আবওয়া গমনের তথ্য জানা এক ভাল গাড়ী ও চালকের ব্যবস্থা করেছেন এবং ঈদের পরদিন ভোরে আমরা যাত্রা করব। এতে আমি খুবই খুশী হই।

কিন্তু সৌদি আরবে ৩০ রমজান হয়ে বৃহস্পতিবারে ঈদ হয়। এতে আমি ও মাওলানা হারুন একমত হই ঈদের পরদিন শুক্রবার জুমা বিধায় তারপরদিন শনিবার ভোরে যাব। আমার সফরসঙ্গী ডা. আবু বকর সিদ্দিক সাহেব ও আবদুল মান্নান সাহেবসহ শনিবার জেদ্দা যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করি। শনিবার দিবাগত রাত তাদের জেদ্দা-ঢাকা বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট বিধায় তারা শনিবার সকালে জেদ্দা চলে যায়। আমার ফ্লাইট পরদিন রবিবার দিবাগত শেষ রাতে সৌদি এয়ারলাইনে জেদ্দা থেকে ঢাকা ফ্লাইট। অতএব, শনিবার যেয়ারতে যেতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল না। পরিকল্পনা মতে ঈদের একদিন পর শনিবারে মসজিদে নববীতে ফজরের নামাজ পড়ে কক্ষে ফিরে এসে অপেক্ষায় থাকি এবং এরই মধ্যে ডা. আবু বকর সাহেব ও মান্নান সাহেবকে জেদ্দা গমনে বিদায় জানাই।

ভোর ছয়টার পরপর গাড়ি নিয়ে মাওলানা হারুন ও সাথে হাফেজ হায়দর আলী আমার কক্ষের নিকটে পৌছে মোবাইল রিং করেন। এতে কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়ি। দেখি নতুন কার, সাথে চালক চট্টগ্রামের চন্দনাইশের মোস্তফা জহির। মোস্তফা জহির মূলত অন্য ব্যবসা করে। তার নিজের সখের ব্যবহারের জন্য এই কার। তবে সুযোগমত মাঝেমধ্যে ভাড়ায়ও যেয়ে থাকে।

আমরা কারযোগে প্রথমে প্রায় ১৫০ কি.মি. দূরত্বে বদরের মহান শহীদাইনের যেয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। প্রায় ৩০/৪০ কি.মি. বর্তমান মদিনা মুনাওয়ারা – মক্কা মোকররমা বৃহদাকারের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পর ভিন্নপথে অগ্রসর হতে থাকি। কিছুদূর গিয়ে মদিনা মুনাওয়ারা – মক্কা মোকররমা সাবেক রাস্তায় পৌছে ঐ রাস্তায় দ্রুত অগ্রসর হতে থাকি। এই সাবেক রাস্তায় মক্কা মোকররমা থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় যাওয়া-আসা করে থাকলেও গত ১৯৮৪ সাল থেকে আর দেখার সুযোগ হয়নি। সাবেক রাস্তা কোন কোন স্থানে ভাল কোন কোন স্থানে ফাটলের সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিলাম। চালক প্রায় ১৫০ থেকে ১৭০ কি.মি. গতিতে তার প্রিয় নতুন কারটি চালাচ্ছিলেন। আমরা প্রায় ৮টার কিছু পরপর বদর পাহাড়ী এলাকায় পৌছে যাই। বদর এলাকায় বহু বালি–আবৃত পাহাড় রয়েছে যা সারা সৌদি আরবে বিরল বলা যেতে পারে।

বর্তমানে বদর একটি ছোট্ট শহর। আমরা শহর সংলগ্ন শহীদাইনের যেয়ারতের উদ্দেশ্যে রাস্তা সংলগ্ন স্থানে নেমে পড়ি। প্রায় ৩/৪ একর এরিয়া নিয়ে কবরস্থান। জান্নাতুল মুআল্লা ও জান্নাতুল বাকীর মত এখানে বদরের শহীদাইনের এরিয়ার নিকটস্থ এলাকায় অর্থাৎ দেওয়াল ঘেরাও-এর ভিতর বদরের বর্তমান স্থানীয় সৌদিগণের কবরস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নতুন-পুরানো বহু কবরের অবস্থান প্রত্যক্ষ করলেও মূলত কোন স্থানে বদরের শহীদাইনের কবরাদি রয়েছে তাহা বুঝে নিতে ইতঃস্তত করছিলাম। এমনি অবস্থায় একজন বৃদ্ধ সৌদি এসে আমাদেরকে বদরের ১৪ জন মহান শহীদদের কবর শরীফের স্থান দেখিয়ে দিলেন যা দেওয়াল ঘেরা এরিয়ার একপাশে রয়েছে। ঐ এলাকাটি পাথরের উপর পাথর বসিয়ে পৃথক ঘেরাও প্রত্যক্ষ করছিলাম।

আগেই উল্লেখ করেছি, বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণের যেমনি পৃথক মর্যাদা রয়েছে তেমনি সাহাবা শহীদ হিসেবে শহীদাইনের বিশ্বে মর্যাদার কথা বলা আছে। মহান আল্লাহপাক পবিত্র কোরআন মজিদে বলেন, "আল্লাহ বদর প্রান্তরে তোমাদের সাহায্য করেছেন যখন তোমরা ছিলে অত্যন্ত দুর্বল।"

কথিত আছে, এখানে বদর ইবনে ইয়াখলাদ ইবনে নাযর ইবনে কিনানাহ বসতি স্থাপন করেন। এতে তাঁর নাম অনুসারে "বদর" নামকরণ করা হয়। মূলত নবী পাক (স.) মক্কা মোকররমা থেকে মদিনা মুনাওয়ারা হিজরত করার পর তথায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং দিনদিন মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে মক্কা মোকররমার কাফেররা তাদের নিজেদের জন্য হুমকি মনে করতে থাকে। সংখ্যা ও সম্পদে বহুলাংশে এগিয়ে থাকায় তারা বারেবারে নানাভাবে মদিনা মুনাওয়ারা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলেও তাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। যেহেতু নবী পাক (স.)-এর জানার বাকী থাকে না মক্কা মোকররমায় বসে সংখ্যাগুরু বিধর্মীরা কি করছে না করছে। নবী পাক (স.) নানাভাবে নানাস্থানে ছোট বড় গ্রুপ করে প্রহরী প্রেরণ করতে থাকেন যাতে হঠাৎ করে অতর্কিতে মদিনা মুনাওয়ারা আক্রমণ করতে না পারে। এই রকম একবার নবী পাক (স.) নিজেও দ্বিতীয় হিজরীতে ৭০ জনের কাফেলা নিয়ে নবী পাক (স.)-এর আম্মাজানের পবিত্র কবর শরীফের স্থান আবওয়া পর্যন্ত পৌছেছিলেন। পরবর্তীতে একবার খুরয ইবনে যাবির ফিহরীর নেতৃত্বে এক সশস্ত্র কাফেলা মক্কা মোকররমা থেকে গোপনে ঝটিকাবেগে এসে মদিনা মুনাওয়ারা আক্রমণ করে বাগানের ক্ষতি ও গৃহপালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। কিন্তু ইসলামী ফৌজগণ তাদের পিছু ধাওয়া করে বদরের নিকটে পর্যন্ত গিয়েছিল। এ ঘটনাকে "বদরে-উলা" বা বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

এর কিছুদিনের ব্যবধানে আবু জাহল গুজব রটালো যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে বাণিজ্য কাফেলা মক্কা মোকররমা ফেরার পথে মুসলমানরা লুট করতে

অগ্রসর হচ্ছে। যেহেতু তাদের সাথে ৫০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রাসহ বহু মূল্যবান সামগ্রী ছিল। আবু জাহলের এ কথা প্রকাশের সাথে সাথে এক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার বাহিনী তৈরী হয়ে অগ্রসর হল। তাদের সাথে ৩০০ ঘোড়া ও ৭০০ উট। ১৫ জন কোরাইশ নেতাও এই যাত্রায় শামিল হল। আবু জাহল মক্কা মোকররমা থেকে ৪/৫ মঞ্জিল অগ্রসর হয়ে জানতে পারল আবু সুফিয়ানের কাফেলা সিরিয়া থেকে বিনা আক্রমণে মক্কা মোকররমা পৌছে গেছে। কিন্তু কুটবুদ্ধিদার আবু জাহল তার বিশাল সশস্ত্র কাফেলার উদ্দেশ্যে বলল, আমরা যখন অনেক পথ এগিয়ে এসেছি অতএব মক্কা (মোকররমা) ফিরে না গিয়ে ইয়াসরেবের (মদিনা মুনাওয়ারা) নিকটে গিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসি। এতে ইয়াসরেবের অমুসলিমরা মুসলমান হতে ভয় পাবে। এবং সারা জজিরাতুল আরব ও মুলকে শামে এর প্রভাব পড়বে। মুসলমানরাও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। যেহেতু তার নেতৃত্বে সুসজ্জিত বৃহৎ আকারের কাফেলা রয়েছে। আবু জাহলের প্রস্তাবে একমত পোষণ করে তারা সিরিয়ার পথ পরিহার করে মদিনা মুনাওয়ারার পথে অগ্রসর হতে থাকে।

নবী পাক (স.) আবু জাহলের এই হিংসাত্মক চক্রান্ত জানতে পেরে হুকুম জারি করলেন যেসকল সাহাবা দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে বের হতে পারবে তারা যাতে বেরিয়ে পড়ে। এতে ৩১৩ জন সাহাবা বেরিয়ে পড়েন। তৎমধ্যে ৮২ জন মোহাজির, ১৫২ জন আনসার এবং বাকিরা অন্যান্য গোত্রীয়। ইসলামী ফৌজে ৩০টি ঘোড়া ও ৭০টি উট মতান্তরে হাতী ছিল মাত্র।

দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমজান শুক্রবার মুসলমানগণ বদর প্রান্তে কাতারবন্দী হয়ে তাদের প্রতিহতের ঘোষণা দিলেন। এতে আবু জাহল বাহিনী গর্বিত হয়ে এক তৃতীয়াংশ মুসলিম কাফেলাকে পরোয়া না করে যুদ্ধ করাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল।

উভয়পক্ষে প্রথমে দ্বৈতযুদ্ধ অতপর সমষ্টিগত যুদ্ধে কাফেররা টিকতে না পেরে পালাতে শুরু করে। এমনভাবে পালাতে হয়, কাফেরদের পক্ষে তাদের সহযাত্রী যুদ্ধে মৃতদের কবর দেয়া বা সাথে করে নিয়ে যাওয়াও সম্ভবপর হয়নি। এ ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে শহীদ হন ৬ জন মোহাজির ও ৮ জন আনসার। অপরদিকে, কাফেরদের পক্ষে নিহত হয় তাদের সর্দার আবু জাহলসহ ৭০ জন। তৎমধ্যে কয়েকজন নামজাদা ব্যক্তিও রয়েছে।

মানবদরদী মহান রসুল (স.) মুসলিম বীর শহীদগণের যেমনি দাফনের ব্যবস্থা করলেন তেমনি ৭০ জন মৃত কাফেরেরও পৃথক স্থানে দাফনের ব্যবস্থা করলেন। তৎমধ্যে ২৪ জন কোরাইশ কাফেরের লাশও ছিল। ৭০ জন কাফের মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হয়। তাদের মধ্যে কোরাইশের হাশেমী ধারার নবী পাকের (স.) কয়েকজন নিকট-আত্মীয়ও ছিল। তাদের মদিনা মুনাওয়ারা নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে বা যথাযোগ্য শ্রমের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয়।

সৌদি কর্তৃপক্ষ বদরস্থ শহীদাইনের নিকটস্থ তেমোহনি রাস্তার সংযোগ স্থলে ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা হয় মত ব্যয়বহুল মার্বেল পাথরে ১৪ জন শহীদের নামফলক স্থাপন করে।

দীর্ঘক্ষণ ধরে বদরের যুদ্ধের মহান শহীদদের যেয়ারত করে প্রায় আরো ১০০ কি.মি. মক্কা মোকররমার পথে নবী পাক (স.)-এর আম্মাজানের যেয়ারতের উদ্দেশ্যে আবওয়া রওয়ানা হয়ে যাই।

বদরের শহীদাইনের যেয়ারতের পর চালক মোস্তফা জহির মদিনা মুনাওয়ারা – মক্কা মোকররমার পুরাতন রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন। বহুদূর যাওয়ার পর একটি পৃথক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ পৃথক রাস্তা দিয়ে কিছুদুর যাওয়ার পর মস্তুরা নামক স্থানে ৬ লেইনের উভয়মুখী বৃহদাকারের রাস্তায় উঠলেন। আমার নিশ্চিত ধারণা, এ রাস্তা মক্কা মোকররমা – মদিনা মুনাওয়ারার নতুন রাস্তা। কিন্তু চালক জহির আমার ভুল ভেঙ্গে দিলেন। এটি অর্থাৎ ৬ লেইনের বৃহদাকারের রাস্তা হল জেদ্দা / মক্কা মোকররমা – ইয়েনবো রাস্তা। চালক জহির ৬ লেইনের বড় রাস্তায় উঠে মক্কা মোকররমা অভিমুখে যেতে শুরু করলেন। এবং কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর রাস্তার পার্শ্বে তীর চিহ্নিত দিকনির্দেশনায় AL ABWA চোখে পড়ল, এতে আমি নিজেকে উৎফুল্লবোধ করলাম। কারণ এই আবওয়াতে হযরত সাইয়্যেদা মা আমেনা চির নিদ্রায় শায়িত। যা আমি ছোটকাল থেকে বারেবারে শুনে আসছিলাম কিন্তু কোন সময় আসার সুযোগ হয়নি।

চালক মোস্তফা জহিরকে কেন জানি চিন্তিত মনে হচ্ছিল। জানতে চাওয়ায় তিনি জানালেন, নবী পাক (স.)-এর আব্বা-আম্মার যেয়ারত করা সৌদি ধর্মীয় দৃষ্টিতে নিষেধ আছে। মাওলানা হারুন বারেবারে বলায় বিশেষ করে আমার কথা বলায় এবং আমার সম্মানার্থে চালক জহির না বলতে পারে নি বিধায় আজকের আবওয়াতে আগমন। আমি বাদে সবাই মা আমেনার যেয়ারতে গমনে যেমনি আগ্রহী তেমনি সৌদি নিষেধের কারণে ভীত। যেহেতু তারা সবাই একামাওয়ালা, আমি ওমরাহ্ হাজী, অতএব আমার ভয় নেই। ইতঃস্তেতর কোন কারণ নেই। আমাকে হয়ত নিষেধ করতে পারবে এর বেশী করার থাকবে না। কিন্তু একামাওয়ালা নানা দিক দিয়ে দুর্বল, তাদেরকে আইনে একটু ব্যতিক্রম দেখলে একামাটি নিয়ে আটক করে ফেলবে। এরকম অবস্থায় ৬ লেইনের রাস্তার ধারে AL ABWA কত দূরে তা নির্দেশিকা বোর্ডে দেখে চালক মোস্তফা জহির অগ্রসর হতে থাকলেন।

প্রায় ১০/১৫ কি.মি. যাওয়ার পর বোর্ডের দিকনির্দেশনা মত আমাদের কার বড় রাস্তার বাম দিকে তথা পূর্ব দিকে ছোট রাস্তা ধরে যেতে থাকে। বড় রাস্তা থেকে ২২ কি.মি. AL ABWA। রাস্তার আকৃতি ছোট হলেও রাস্তা মসৃণ ও নতুন নির্মিত বলা যায়। এই রাস্তায় গাড়ী চলাচলও কম মনে হচ্ছিল।

এই ছোট ও নয়া রাস্তা দিয়ে প্রায় ১২/১৪ কি.মি. যাওয়ার পর চালক মোস্তফা জহির

রাস্তার বাম পার্শ্বে পেট্রোল পাম্পে গিয়ে থামেন প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য। চালক পেট্রোল পাম্প থেকে সতর্কতার সাথে জেনে নেন হযরত সাইয়্যেদা মা আমেনার পবিত্র কবর শরীফের স্থান। ঐ পেট্রোল পাম্পের মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে রাস্তার উত্তর পার্শ্বে ছোট পাহাড়ের উপর মা আমেনার কবর শরীফ ছিল। সৌদি সরকারের পুলিশ বাহিনী ও ধর্মীয় নেতাগণ বারে বারে নিষেধ ও একামাওয়ালাদের একামা কেড়ে নিয়ে নানান শাস্তি প্রদানের পরও যেয়ারতকারীগণের আগমন থামানো যাচ্ছিল না। '৮০-এর দশকে মস্তুরা থেকে AL ABWA আসার রাস্তা ছিল না। '৮০-এর দশকের শেষের দিকে বা '৯০-এর দশকে রাস্তা নির্মিত হওয়ায় যেয়ারতকারীগণের আগমন দ্রুত বেড়ে যায়। এতে সৌদি কর্তৃপক্ষ হযরত সাইয়্যেদেনা আমেনার কবর শরীফ এর কাঠামো মাত্র ৫/৬ বছর আগে বুলডোজার দিয়ে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। এমনভাবে ধুলিস্যাৎ করা হয় যাতে করে যেয়ারতকারীগণ কবর শরীফের স্থান বুঝে উঠতে না পারে।

আমরা এসব দুঃখজনক তথ্য জেনে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। পাহাড়ি এলাকার মাঝদিয়ে আমাদের বহনকারী কার ধীরগতিতে চলতে থাকে। এবং নির্দিষ্ট স্থানের নিকটে এসে নিকটস্থ একমাত্র দোকানের দিকে যান চালক মোস্তফা জহির। ঐ দোকানে এক বাংলাদেশী কর্মচারী থাকায় সুবিধা হয়। সে দেখিয়ে দিল নিকটস্থ কোন্ এরিয়ায় পবিত্র কবর শরীফ। সেও ৫/৬ বছর আগে বুলডোজার দিয়ে কবরশরীফ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া এবং যেয়ারতকারীগণকে ধরপাকড়ের কথা জানাল। তারপরও আমার অতি আগ্রহে চালক জহির অতি ভীত হয়েও গাড়িযোগে অভীষ্ট স্থানের নিকটে যান। দেখি আমাদের মত এখনও যেয়ারতকারীগণের আগমন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই। সেখানে গাড়ির চাকার প্রচুর ছক দেখতে পাচ্ছিলাম। আমরা চতুর্দিকে দৃষ্টি দিয়ে সৌদি কেহ আছে কি না দেখি এবং সাথে সাথে যেয়ারতে মনোনিবেশ করি। তবে বদরের শহীদাইনের মত দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করি নাই। যেহেতু আমার কারণে যদি অপরাপর সবাই বিপদগ্রস্ত হয় এই কারণে।

প্রথমবার হজে গমন করে মদিনা মুনাওয়ারা যেয়ারতে গেলে মসজিদে নববীর পশ্চিম পার্শ্বে মাত্র কয়েকশ' মিটার পশ্চিমে নবী পাক (স.)-এর আব্বাজান হযরত আবদুল্লাহ-এর যেয়ারত করেছিলাম এক দালানের ভিতর অনেকের সাথে। কিন্তু মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের অজুহাতে হযরত আবদুল্লাহর কবর শরীফও সৌদি কর্তৃপক্ষ ধুলিস্যাৎ করে দেয়। বর্তমানে কোন্ স্থানে নবী পাক (স.)-এর আব্বাজানের কবর শরীফ তা নির্ণয় করা কঠিন।

নবী পাক (স.)-এর মোবারক জীবনের উপর বেশ কিছু গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ আমার নিকট রক্ষিত আছে। তৎমধ্যে দু'তিনটি গ্রন্থে নবী পাকের (স.) আম্মাজানের কবর শরীফ মদিনা মুনাওয়ারা ও মক্কা মোকররমা মধ্যবর্তী স্থান আবওয়া নামক স্থানে বলে পরিস্কার উল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকে বদরের নিকটবর্তী কোন স্থানে নবী পাকর (স.) আম্মাজানের কবর শরীফ বলে যেয়ারত করে ভুল করে থাকেন বলে মনে করি।

বর্তমান বাদশা আবদুল আজিজ পরিবার মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদীর অনুসারী। নজদী আকিকা মতে নবী পাক (স.)-এর আব্বাজান ও আম্মাজান কাফের। এবং কাফের হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব, ইসলাম ধর্মমতে নবী পাক (স.)-এর আব্বাজান ও আম্মাজানের কবর শরীফে গিয়ে সালাম পেশ দোয়া দরূদ পড়া ইসলাম ধর্ম মতে নিষেধ রয়েছে। সৌদি নিষেধ বারে বারে অমান্য করতে থাকায় তারা উভয় কবর শরীফকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় যাতে করে কেউ এই বেদায়াত আর করতে না পারে। নজদীগণের আকিকা যদি তাই না হয় তবে তারা তথা সৌদি কর্তৃপক্ষ দু'জাহানের সর্দার নবীকুল শিরোমণি আমাদের নবী পাক (স.)'র মহান পিতামাতার পবিত্র কবর শরীফকে ধুলিসাৎ করে কবর শরীফের চিহ্নটুকু মুছে দেয়ার কি বা কারণ হতে পারে। উম্মতে মোহাম্মদীগণ তথায় গিয়ে যেয়ারত করতেছেন কোন্ শিরিক বা বেদায়াত করতেছেন বলে মনে করি না।

অপর দিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতে আকিদা বা বিশ্বাস হচ্ছে নবী পাক (স.)-এর পিতা-মাতা ঈমানদার। হযরত আদম (আ.) হতে রক্ত ধারা প্রবাহিত হয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ও হযরত মা আমেনা পর্যন্ত পাপকর্ম মুক্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত এবং এই রক্তধারায় মহান আল্লাহপাকের নারাজির কর্মকাণ্ড ছিল না। হযরত আদম (আ.) হতে হযরত আবদুল্লাহ ও মা আমেনা পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। কোন ব্যাভিচার ছিল না। এবং বংশধারা পাক পবিত্র –এ প্রসংগে বহু হাদিস শরীফ রয়েছে।

যেখানে নবী পাক (স.)-এর নবুয়ত পাওয়ার আগে তার পিতা-মাতা ইন্তেকাল করেন সেখানে নবী পাক (স.)-এর হাতে সরাসরি ঈমান আনার প্রশ্নই ওঠে না। এমতাবস্থায় নবী পাক (স.)-এর পিতা-মাতা আখেরাতে নাজাত পাবেন না এইরূপ চিন্তা করাও বাতুলতা ছাড়া আর কি হতে পারে। পবিত্র কোরআন মজিদে আল্লাহপাক ওয়াদা করেছেন তিনি তার হাবীবকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করবেন। সুতরাং আল্লাহপাকের হাবিবের পিতা-মাতাকে আল্লাহপাক আখেরাতে সম্মান প্রদর্শন না করবেন এরকম ভাবা যাবে না।

নবী পাক (স.) পিতা-মাতার জন্য হা-হুতাশ করতে থাকায় আল্লাহ পাক নবী পাক (স.)-এর পিতা-মাতাকে রুহানীভাবে হাজির করেন এবং ঈমান আনেন। নবী পাক (স.) নিজে তার পিতা-মাতার যেয়ারত করেছেন। অতএব উম্মতে মোহাম্মদী নবী পাক (স.)-র পিতা মাতার যেয়ারত করা বৈধ ও সওয়াবের কাজ।

উল্লেখ্য, হযরত আবদুল্লাহ বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়লে ইয়াসরিব (মদিনা মুনাওয়ারা) যাত্রা বিরতি দেন। মদিনা মুনাওয়ারা আবদুল মোত্তালিব এর মামার বাড়ি। ঐ অসুস্থ অবস্থায় একমাস কাটিয়ে হযরত আবদুল্লাহ মদিনা মুনাওয়ারাতে ইন্তেকাল করেন এবং তথায় তাকে দাফন করা হয়। যখন নবী পাক (স.) মায়ের গর্ভে ২ মাস মাত্র তখন হযরত আবদুল্লাহর বয়স ১৮ মতান্তরে ২৪ বৎসর।

অপরদিকে নবী পাক (স.)-র বয়স যখন ৬ বৎসর তখন হযরত মা আমেনা তাকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্র যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা মোকররমা থেকে ৪২৫ কি.মি. উত্তরে মদিনা মুনাওয়ারা গমন করেন। সাথে পরিবারের পরিচারিকা উম্মে আয়মানও ছিলেন।

হযরত মা আমেনা নবী পাক (স.) কে নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় আত্মীয় স্বজনের কাছে ১ মাস অবস্থান করে মক্কা মোকররমা ফিরে আসতে থাকেন। এই ফেরার পথে মদিনা মুনাওয়ারা ও মক্কা মোকররমার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক পাহাড়ি এলাকায় হযরত মা আমেনা ইন্তেকাল করেন। এই সময় মাত্র ৬ বছরের শিশু নবী পাক (স.) জননীর শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আমেনা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রিয় বৎস! আল্লাহ তোমাকে বরকতময় করুন। হে মৃত্যু পথযাত্রী মায়ের পুত্র, আল্লাহর নেয়ামতরাজির বদৌলতে লটারির সময় একশত উটের বিনিময়ে তোমার পিতা বেঁচে যান আর আমার স্বপ্ন সত্য হলে তুমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রেরিত হবে। তুমি সেই দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হবে যা তোমার পিতা ইব্রাহিমের ধর্ম। কেননা আল্লাহ্ তোমাকে মোশরেকি কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখবেন।"

অতপর হযরত মা আমেনা ইন্তেকাল করেন। তখন তার বয়স ২৫ মতান্তরে ৩০ বৎসর। সাথী ও পরিচারিকা উম্মে আয়মান তথায় হযরত মা আমেনাকে সমাহিত করেন এবং ৬ বছরের শিশু নবী পাক (স.)-কে সাথে নিয়ে মক্কা মোকররমা পৌছে নবী পাক (স.)-কে আবদুল মোত্তালিব এর বরাবরে সোপর্দ করেন।

নবী পাক (স.) মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার পর হযরত মা আমেনার যেয়ারত করেন। মতান্তরে একাধিকবার যেয়ারত করেন বলে বলা হয়। একবার বদর যুদ্ধের আগে মক্কা মোকররমা মুশরেকদের আক্রমণাত্মক কার্যক্রমকে পাহারার উদ্দেশ্যে আবওয়া এসেছিলেন। মক্কা মোকররমা বিজয়ের পর কিংবা বিদায় হজ্বের পর মক্কা মোকররমা থেকে মদিনা মুনাওয়ারা ফেরার পথে মায়ের যেয়ারত করেন। শিশুকালে মাতৃহারা নবী পাক (স.) তাঁর মায়ের কবর যেয়ারতকালে মাতৃশোকে এতবেশি কেঁদেছিলেন যা নবী পাক (স.)-কে আর কখনো দেখা যায় নাই। এবং নবী পাক (স.)'র কান্নায় সাহাবাগণও কেঁদেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী পাক (স.) আল্লাহপাকের কাছে প্রার্থনা করেন তাঁর পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেওয়া হোক। অতঃপর আল্লাহতালা তাদের জীবিত করে দেন। উহাতে তাঁরা নবী পাক (স.)-এর উপর ঈমান আনেন। পরবর্তীতে আবার তাদের ইন্তেকাল হয়।

সৌদি কর্তৃপক্ষ নবী পাক (স.)-এর যেয়ারতের বিপক্ষে বিধায় প্রয়োজনে কড়াকড়ি আরো বাড়িয়ে দিতে পারত অথবা যেয়ারতকারীগণকে বিরত রাখার জন্য পুলিশ মোতায়েন করতে পারত। কিন্তু তা না করে নবী পাক (সঃ) এর মহান পিতা-মাতার পবিত্র কবর শরীফকে ধুলিসাৎ করে দেয়া নবী পাকর (স.) শানে চরম বেয়াদবী নয় কি?

স্বল্প সময়ে যেয়ারত শেষ করে AL ABWA থেকে লোহিত সাগরের তীরবর্তী তেলের শহর ইয়ানবোতে চলে যাই। তথায় সাগর তীরে ঘুরাফিরা করে ঐ শহরের প্রধান মসজিদে যোহরের জামাত পড়ি। অতপর দুপুরের খাবার খেয়ে মদিনা মুনাওয়ারা অভিমুখে রওয়ানা হই।

পথিমধ্যে মদিনা মুনাওয়ারার ৮৫ কি.মি. আগে থাকতে পুরাতন রাস্তা সংলগ্ন বীর আর রওয়াহ-এর অলৌকিক কূপ দেখে মদিনা মুনাওয়ারা প্রবেশ করি এবং বরকতময় কু'বা মসজিদে আসরের জামায়াতে শরীক হই। অতঃপর শহীদাইনে ওহুদের যেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করি।

দেশে নবী পাকের (স.) কদম শরীফ চিহ্নিত পাথর

আমাদের দেশে বেশ কয়েক জায়গায় নবী পাকের (স.) পবিত্র কদম শরীফ তথা পা মোবারক চিহ্নিত পাথর হিসাবে সসম্মানে সংরক্ষণ করা আছে। চৌদ্দশত বছর আগে নবী পাকের (স.) ওফাতের পর ছাহাবাগণের উছিলায় নবী পাকের (স.) কেশ মোবারকসহ ব্যবহৃত বেশ কিছু জিনিসপত্র বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত আছে বলে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে নবী পাকের (স.) ব্যবহৃত জিনিসের সমৃদ্ধ স্থান হল তুরস্কের ইস্তাম্বুল নগরী। তুর্কী খেলাফতের সাবেক রাজধানী এ ইস্তাম্বুল। তেমনি বিশ্বের বহু দেশে নবী পাকের (স.) ব্যবহৃত ও দেহ মোবারকের পবিত্র কেশ এবং নখ রয়েছে। ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী শ্রীনগরের বিখ্যাত হযরতবাল মসজিদে নবী পাকের (স.) কেশ মোবারক সংরক্ষিত আছে।

আমাদের দেশে তিন স্থানে নবী পাকের (স.) পা মোবারকের চিহ্নিত পাথর সংরক্ষিত আছে। দেশের আরো ২/১ স্থানে নবী পাকের (স.) পা মোবারক চিহ্নিত পাথর আছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। কিন্তু তিন স্থান ছাড়া বাকী স্থানের কথা এ মুহূর্তে স্মরণ আসছে না। তবে ভারতের গৌড় ও আহমদাবাদ ছাড়াও কলকাতা নগরীর শিয়ালদহ এলাকায় এবং কর্নটিক রাজ্যেও নবী পাকের (স.) কদমের চিহ্নিত পাথর রয়েছে বলে জানা যায়। তবে গৌড় ও আহমদাবাদের বরকতময় পাথর তথায় গমনে দেখার সুযোগ হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নবী পাকের (স.) ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যে সমৃদ্ধ স্থান তথা যাদুঘর ইস্তাম্বুলের টপকাপি যাদুঘর। নবী পাকের (স.) ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়া দন্দান মোবারকের টুকরা, চুল মোবারক ও ব্যবহৃত কাপড় ইত্যাদি এ যাদুঘরে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। তেমনি মদিনা মুনাওয়ারা রওজা পাকের পূর্বপাশ সংলগ্ন জান্নাতুল বাকীর পশ্চিমে লাইব্রেরী ভবন ও সংলগ্ন কক্ষেও কিছু বরকতময় ব্যবহৃত জিনিস সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু সত্তর দশকের শেষের দিকে বা আশির দশকের শুরুতে ঐ সব মোবারক জিনিসপত্র সৌদি সরকার সরিয়ে ফেলে এবং লাইব্রেরী ভবনসহ নিকটস্থ সব অবকাঠামো ভেঙ্গে ফেলে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের প্রয়োজনে। এতে করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নবী পাকের (স.) চুল মোবারক, দন্ত মোবারক, ব্যবহৃত জুব্বা,লাঠি, পাগড়ি ইত্যাদি যে সযত্নে সংরক্ষিত তা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। তেমনি আমাদের দেশে তিন স্থানে নবী পাকের (স.) কদম শরীফের চিহ্নিত পাথর রয়েছে যা থেকে নবী-প্রেমিকগণ দর্শন লাভের মাধ্যমে বরকত হাসিল করে আসছে।

এই তিন স্থানের এক স্থান হল : দক্ষিণ চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার আরাকান মহাসড়ক সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত বাগিচাহাটের প্রসিদ্ধ জামে মসজিদ সংলগ্ন

উত্তর পার্শ্বে। কয়েক শত বছর আগে অর্থাৎ মুঘল আমলের শেষের দিকে মুঘল সম্রাটের সুবেদার বা তার প্রতিনিধির পৃষ্ঠপোষকতায় নবী পাকের (স.) কদম চিহ্নিত এ পাথরটি এখানে সংরক্ষণ করা হয়। অবশ্যই তার কোন তথ্যভিত্তিক বিবরণ ইতিহাস পর্যালোচনা করে বের করতে ব্যর্থ হই। আরেকটি পবিত্র পাথর হল- চট্টগ্রাম মহানগরীর কেন্দ্রস্থল মোমিন রোডে। নবী পাক (স.) পবিত্র কদম চিহ্নিত পাথরের বদৌলতে এ এলাকার নামকরণ হয় কদম মোবারক হিসাবে। মুঘল আমলে নির্মিত এ মসজিদ সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে নবী পাক (স.) কদম চিহ্নিত এ পাথর মুঘল শাসক নবাব ইয়াসিন খানের স্মৃতি বহন করে চলছে।

১৭১৯, মতান্তরে ১৭২৩ সালে নবাব ইয়াসিন খান মসজিদ সংলগ্ন কক্ষ তৈরী করে এ পবিত্র পাথর সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ পবিত্র পাথর ১৮০০ শতকে নোয়াখালী ও কুমিল্লা শাসক শমসের গাজীর কাছে থেকে উপহার হিসাবে পেয়েছেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। অপরদিকে, নবাব ইয়াসিন খান এ পবিত্র পাথর মদিনা মুনাওয়ারা থেকে সংগ্রহ করেছেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কদম মোবারক মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে কবরস্থানে বহু বছর থেকে মুসলমান নর-নারী চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। নবাব ইয়াসিন খান কোথায় থেকে কিভাবে এ পাথর পেলেন তার কোন সঠিক বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। দৈনিক অগণিত মানুষ এ পবিত্র পাথর ধৌত পানি পান করে বরকত হাসিল করছে।

দেশের অপর আরেকটি পাথর সংরক্ষিত আছে নারায়ণগঞ্জ শহর সংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে কদমরসুল নামক স্থানে। নবী পাকের (স.) কদম চিহ্নিত পাথরের বদৌলতে এলাকার নামকরণ হয়ে গেছে কদমরসুল।

৯৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৫৮০ সালে মাসুম খান কাবুলী পবিত্র কদম রসুল তথায় স্থাপন করলেও আরো শত বছর আগে এর সংগ্রহকারী হাজী নুর মোহাম্মদ নামক এক তাপস। তিনি আরবীয় এক বণিকের কাছ থেকে কয়েক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে এ পাথর সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। সাগর ও নদী পথে তথায় পৌঁছে অবস্থান করতে থাকেন। বাংলার তৎকালীন জমিদার ঈসা খান কদমরসুল পাথর ৬০ ফুট উচ্চতায় মাটির টিলার উপর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ঈসা খানের পৌত্র মনোয়ার খান তথায় মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৭৭৭ সালে তৎকালীন ঢাকার জমিদার গোলাম নবী টিলার উপর একতলা ইমারত নির্মাণ করেন এবং বিশাল এক তোরণ নির্মাণ করেন যা শীতলক্ষ্যা নদীর অপর প্রান্ত নারায়ণগঞ্জ শহর থেকে দেখা যেত। কদমরসুলে হাজী নুর মোহাম্মদ ও তার বিবির কবর এবং ইসলাম প্রচারক হযরত সৈয়দ বোরহান উদ্দিন শাহর মাজার রয়েছে। আরো রয়েছে মুঘল সেনাপতি মীর্জা নাথানের পিতা সেনাপতি ইহতেশাম খানের মাজার। প্রতিদিন অগণিত নর-নারী কদমরসুলে ভিড় করে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ শহর থেকে শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে ৫/৭শ মিটার দূরত্বে এর অবস্থান।

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের দেশে এ তিন স্থানসহ উপমহাদেশের যেসব স্থানে নবী পাকের (স.) পবিত্র পদচিহ্নিত পাথর সংরক্ষিত রয়েছে বাস্তবে তার সত্যতা কতটুকু? যেহেতু পবিত্র পাথরের ইতিহাস ৬/৭ শত বছরের বা হাজার বছরের, এর আগের নয়। বলা বাহুল্য, উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে আরব ভূমিতে শিয়া, বোখরা, হারেজী, রাফেয়ীসহ বহু নতুন নতুন উপদল আবিষ্কৃত হয়েছিল। এরা মুসলমানদের মধ্যে নবী পাক (স.) ও আহলে বায়েতের প্রতি মহব্বত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনেক নতুনত্ব আবিষ্কার করেছিল। কাজেই নবী- প্রেমিকের অনুভূতিকে ব্যবহারের জন্য এসব পবিত্র পাথর আবিষ্কার করা হয়েছে না কি চৌদ্দশত বছর আগে প্রকৃতই এসব পবিত্র পাথর নবী পাকের (স.) পদচিহ্নিত তার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। সঠিক হয়ে থাকলে চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস না থাকার কারণ বোধগম্য নয়। আশা করব উপমহাদেশের এবং আমাদের দেশের এসব পবিত্র পাথরের সঠিক ব্যাখ্যাদানের ব্যাপারে ইতিহাসবিদগণ এগিয়ে আসবেন। উল্লেখ্য, পবিত্র কোরআন-হাদিস শরীফ মতে স্বীকৃত মুসলমান জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর পদচিহ্নিত পাথর পবিত্র ক্বাবার পূর্বে সংরক্ষিত আছে যা হাজার হাজার বছরের সঠিক ইতিহাস।

কাবা শরীফ ধ্বংস করতে এসে আব্‌রাহা বাদশাহর পরিণতি

নবী পাক (স.)-এর জন্মের মাত্র ৫০ দিন আগে ইয়েমেনের জালিম বাদশাহ আব্‌রাহা পবিত্র কাবা শরীফ ধ্বংস করতে আসে। মুজদালেফা ও মিনার মধ্যবর্তী স্থানে বহু হস্তীসহ তার বিশাল বাহিনী মহান আল্লাহপাকের গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, এ কোন রূপকথা তথা কিস্‌সা নয়, বাস্তব সত্য ইতিহাস। সেকালে আফ্রিকার আবিসিনিয়ার নিয়ন্ত্রণে ইয়েমেন ছিল। লোহিত সাগরের পশ্চিম পাড়ে আবিসিনিয়া এবং পূর্ব পাড়ে ইয়েমেন। আবিসিনিয়ার ইয়েমেনীয় গভর্ণর আরবাদকে বিদ্রোহের মাধ্যমে হত্যা করে আব্‌রাহা গভর্ণর হয়ে আবিসিনিয়ার বশ্যতা স্বীকার করে নেয় করুণভাবে। পরে সুযোগ বুঝে নিজে নিজে বাদশাহ মনে করতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে ইয়েমেনে নিজের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করে নেয়। সে নিজেকে নিজে ক্ষমতার দাপটে অতীব বলীয়ান মনে করতে থাকে।

মানুষ হজ্ব করতে মক্কা মোকররমা না গিয়ে তার নিকটে আসতে বাধ্য করতে কু-ইচ্ছা জাগে। ফলে তার রাজধানী সানা'আর কিল্লার ভিতর এক তথাকথিত কাবা নির্মাণ করে নেয়; বিশাল ব্যয় করে চোখ ঝলসানো ইমারত নির্মাণ করে। অতঃপর সে তার হস্তীবাহিনী ও বিশাল সৈন্যসামন্ত নিয়ে হেজাজের দিকে ছুটে চলে। সেকালেও কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে হজ্ব করার প্রচলন ছিল এবং হেজাজবাসীরা কাবা শরীফকে তাদের সৌভাগ্য ও গর্বের ইমারত মনে করে থাকতেন। সেকালেও প্রত্যেক নবী-রাসূল মূলকে শাম থেকে হেজাজের মক্কা মোকররমা এসে হজ্ব করে ফিরে যেতেন। হেজাজবাসীরা তাদের তখনকার ধর্মবিশ্বাস মতেও কাবা শরীফের সম্মান রক্ষা করা দায়িত্ব মনে করে থাকতেন। ফলে হেজাজের পাশাপাশি দেশ ইয়েমেনের জনগণও কাবা শরীফকে সম্মানের চোখে দেখত। বাদশা আব্‌রাহা'র বাহিনী হেজাজের দিকে ধাবিত হবার সংবাদ পেয়ে হেজাজবাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ইয়েমেনের কিছু কিছু লোকজন আব্‌রাহার এ জঘন্য অন্যায় কাজের বিরোধী ছিলেন। তৎমধ্যে আমীর জুনায়ার নামক জনৈক প্রভাবশালী ধনী ইয়েমেনী কিছু সংখ্যক আরব লোকজনসহ আব্‌রাহাকে বাধা দেয় পথিমধ্যে। কিন্তু আব্‌রাহার বিশাল বাহিনী তাদের পরাজিত ও হত্যা করে তাদের প্রধান আমীর জুনায়ার-কে বন্দী করে।

অতঃপর খাছআম গোত্রের সর্দার নোফাইল ইবনে হাবিব-এর সাথে মোকাবেলা হয়। কিন্তু তার বাহিনীকেও আবরাহার বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করতে হল এবং তিনিও বন্দী হলেন। অতপর আব্‌রাহা বাহিনী তায়েফ হয়ে মক্কা মোকররমার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অগ্রবর্তী দল দিয়ে আসওয়াদ ইবনে

মাকছুদ নামক হাবসী সেনাপতিকে অগ্রে মক্কা (মোকররমা) পৌছে আক্রমণ শুরু করতে আদেশ দিল। কিন্তু সে সেনাপতি মক্কার (মোকররমা) নিকটে দেখতে পেল কোরায়েশ ও অন্যান্য গোত্রের বহু সংখ্যক উট, মেষ ও বকরীর পালের ঝাঁক মাঠে চরে বেড়াচ্ছিল। সেনাপতির নেতৃত্বে অগ্রবর্তী দল উট, বেড়া, বকরীগুলো ধরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। তৎমধ্যে কোরাইশ সর্দার নবী পাকের (স.) দাদা আবদুল মোত্তালিবের দুইশত উটও ছিল।

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আবদুল মোত্তালিব তার কোরাইশ গোত্রসহ কেনানা, হুজাইল প্রভৃতি গোত্রের সাথে পরস্পর পরামর্শ করলেন কিভাবে আব্‌রাহার বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করা যায়। কিন্তু গোত্ররা এই বিশাল আব্‌রাহা বাহিনীর মোকাবেলা করতে সাহস করল না। সুতরাং মক্কা (মোকররমা) ত্যাগ করে নিকটস্থ পাহাড়ে আশ্রয় নেয়া সমুচিত মনে করতে থাকে। ইতোমধ্যে মূল আব্‌রাহা বাহিনী মক্কার (মোকররমা) নিকটে এসে পৌছে যায়।

অতঃপর আব্‌রাহা বাদশা মক্কার (মোকররমা) সরদারকে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে খবর পাঠায়। এতে নবী পাকের (স.) দাদা আবদুল মোত্তালিব সরদার বিধায় আব্‌রাহার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। তখন আব্‌রাহা বলে যে, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য কাবাঘর (শরীফ) ধ্বংস করা আর কোন উদ্দেশ্য বা কারো কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নয়।

মহান আবদুল মোত্তালিব অত্যন্ত সুন্দর দেহের গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। আব্‌রাহা আবদুল মোত্তালিবকে তার সম সম্মান প্রদর্শনপূর্বক পার্শ্বে বসাল।

আলাপের মধ্যে মূল প্রসংগ আসলে আবদুল মোত্তালিব বললেন, আপনার বাহিনী আমার উটগুলো ধরে নিয়ে এসেছে, অনুগ্রহ করে আমার উটগুলো ছেড়ে দিন। একথা শুনে আব্‌রাহা হতবাক হয়। যেহেতু মক্কা (মোকররমা) বাসীর অত্যধিক প্রিয় ও সম্মানিত কাবা (শরীফ), তাদের সরদার কাবার (শরীফ) কথা না বলে নিজের উট রক্ষার কথা বলতেছে। এতে আবদুল মোত্তালিবকে বেকুব মনে করে কৌতুহলী হয়ে আবরাহা কাবার (শরীফ) কথা না বলার কারণ জানতে চাওয়ায় আবদুল মোত্তালিব বললেন, উটগুলো তার নিজের, কাজেই উট ফেরৎ পেতে তিনি আবেদন করতেছেন। কিন্তু কাবা (শরীফ) তাদের ঘর নহে, আল্লাহতা'লার ঘর। তিনি নিজে তার রক্ষক। কাবাঘর (শরীফ) রক্ষা করা আল্লাহরই দায়িত্ব। অতপর আব্‌রাহা বলল, কিন্তু কাবাকে (শরীফ) তার হাত থেকে তথা ধ্বংস হওয়া থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কথার শেষ পর্যায়ে আব্‌রাহা সেনাবাহিনীকে আবদুল মোত্তালিবের উটগুলো ছেড়ে দিতে আদেশ করল।

ঐ আলোচনায় আবদুল মোত্তালিবের সাথে অন্য দু'গোত্রের সরদার ইয়ামার এবং খুওয়াইলেদও ছিলেন। ফেরার পূর্বকালে তারা আব্‌রাহাকে প্রস্তাব করেন, যদি কাবা (শরীফ) ধ্বংস করতে বিরত থাকে তবে তেহাসা নামক অঞ্চলের এক-

তৃতীয়াংশ তার বরাবরে হাদিয়া হিসেবে দেবেন। কিন্তু আব্‌রাহা নিজের শক্তির মোহে মত্ত থাকায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজের সংকল্পে অটল থাকল।

আবদুল মোত্তালিব আলোচনা শেষে ফিরে এসে কেরায়েশসহ সকল গোত্রকে সংবাদ পৌছান এবং নিকটস্থ পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে পরামর্শ দিলেন, যাতে এই মর্মঘাতী দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে না হয়। অতপর আবদুল মোত্তালিবের নেতৃত্বে অনেকে কাবা শরীফে গিয়ে দরজার শিকল ধরে করুণ সুরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আল্লাহপাকের দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, যাতে আল্লাহপাক তার ঘর তিনি রক্ষা করেন। যেহেতু আব্‌রাহার বিশাল বাহিনীর কাছে মক্কা (মোকররমা) বাসী ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র।

আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করে মক্কা (মোকররমা) বাসী নিকটস্থ পাহাড়ে আশ্রয় নিল। পরদিন ভোরে আব্‌রাহা নিজের সেনাবাহিনীকে মক্কার (মোকররমা) দিকে অগ্রসর করাল। প্রথম সারিতে হস্তীবাহিনী ছিল। তার পেছনে বিশাল পদাতিক বাহিনী।

সে বিশাল বাহিনী মক্কার (মোকররমা) নিকটে মিনা ও মুজদালিফার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছে, তখন হঠাৎ বায়ু প্রবাহ শুরু হয়ে আবহাওয়া পরিবর্তন হয়ে অন্ধকারাচ্ছান্ন হয়ে যায়। অতপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে আব্‌রাহার বাহিনীর উপর ছেয়ে যায়। পাখিগুলোর মুখে একটি ও দুই পায়ে দুইটি করে পাথর ছিল।

দলে দলে অসংখ্য পাখি আব্‌রাহার বিশাল হস্তী বাহিনীসহ পদাতিক বাহিনীর উপর পাথর ফেলতে থাকল। পাথরগুলো সেনাবাহিনীর শরীরের যে স্থানে পড়ে তথায় শরীরে ঢুকে অপরদিক দিয়ে বাহির হয়ে যেতে থাকে এবং ঐ দিকে মুহূর্তে পচন ধরে মৃত্যুবরণ করতে থাকে। কিছু সংখ্যক সেনা সদস্য দ্রুত পলায়ন করে ফিরে গিয়ে ইয়েমেনে সংবাদ প্রেরণ করে। এ অবস্থায় আব্‌রাহা তার হস্তীকে সামনের দিকে ধাবিত করতে ব্যর্থ হয় বরং হাতি পিছনের দিকে পালাতে উদ্যত। এ অবস্থায় পাথরের আঘাতে আব্‌রাহা বাদশারও শরীরের রক্তমাংস গলিত হতে থাকে এবং একটি মাংসপিণ্ডের মত হয়ে ইয়েমেনে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। ঐ কঠিন অবস্থায় আব্‌রাহা ইয়েমেনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই প্রসংগে মহান আল্লাহপাক পবিত্র কোরান মজিদে সুরা ফীল নাজিল করেন। এতে আল্লাহপাক তাঁর রসূলকে সাক্ষ্য করে বলেন, "আপনি কি দেখেন নাই (অর্থাৎ আপনি কি জানেন নাই) যে আপনার পরওয়ারদিগার হস্তীওয়ালাদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন? তাদের ষড়যন্ত্রকে নিষ্ফল করে দেন নাই কি? এবং পাঠিয়েছিলেন তাদের উপর পাখির ঝাঁক। উহারা তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল প্রস্তর খণ্ড, ফলে আল্লাহ তাদেরকে চর্বিত ভূষির ন্যায় করেছিলেন।"

মূলতঃ এ বিস্ময়কর ঘটনাটি মহররম মাসে নবী পাক (স.)-এর জন্মের পঞ্চাশ

দিন পূর্বে ঘটেছিল। আব্‌রাহা বাদশার শাসন আমল হলো ৫২৫ থেকে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ইথিওপিয়ার সেনাপতি হিসাবে ২৫ বছর বয়সে সে শাসনভার গ্রহণ করে। পরবর্তীতে স্বাধীন শাসক হিসেবে ৭০ বছর বয়সে আল্লাহপাকের গজবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পরবর্তীতে নবী পাক (স.)-এর নির্দেশে হযরত আলী (র.)-এর নেতৃত্বে ইয়েমেন মুসলিম শাসনাধীনে চলে আসে।

ইয়েমেনের রাজধানী সানা মহানগরীর পুরাতন সা'না এরিয়া রয়েছে। আবরাহা নির্মিত তথাকথিত কাবাঘর এর স্থান। বিলীন হওয়ার পরও কোন সরকার ঐ স্থানকে ব্যবহার করেনি। ফলে আজও শহরের মাঝখানে পরিত্যক্ত ভূমি হিসেবে দেওয়াল ঘেরা রয়েছে আব্‌রাহা বাদশাহর তথাকথিত সেই কাবাঘরের স্থান।

সৌদি আরবের তায়েফ গমন ও তথা হতে ওমরাহ

সৌদি আরবের শৈল শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম হল তায়েফ। এ শহর সা'রাত পর্বতমালার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এ পর্বতমালা তায়েক থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে আল্‌বাহা ও আবাহা হয়ে ইয়েমেনের রাজধানী সা'না অতিক্রম করে ইয়েমেনের প্রাচীন বন্দর নগরী আদনের কাছাকাছি গিয়ে শেষ হয়। মক্কা মুকাররমা হতে তায়েফের দুরন্ত সরাসরি প্রায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার। তবে ঝুঁকিপূর্ণ পর্বত সড়ক পরিহরে ঘুরে গেলে ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার। জেদ্দা থেকে তায়েফ যেতে হলে মক্কা মুকাররমার পাশ দিয়ে যেতে হয়। তায়েফ সৌদি আরবের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৫ হাজর ফুট। তবে উচ্চতায় আবাহা শহর থেকে কিছুটা নিচে।

এখানে শীতকালে মাঝেমধ্যে পানি বরফ জমাট বেধে যায়। এককালে তায়েফ ছোট শহর থাকলেও ভৌগলিক অবস্থান ও গ্রীষ্মকালীন শহর হওয়ার কারণে বর্তমানে সৌদি আরবের বড় বড় শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম।

তায়েফের ইতিহাস প্রাচীন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-র আমল থেকে তায়েফের ইতিহাস পাওয়া যায়। তায়েফ মরুভূমি মধ্যবর্তী উচ্চ পর্বত এলাকা বিধায় অনুকূল আবহাওয়ার কারণে তথায় অত্যধিক ফলমূল ও শাকসজী উৎপন্ন হয়। তায়েফের নিকটে মক্কা মুকাররমা মরুভূমি প্রবণ উষ্ণ এলাকা। ফলে মক্কা মুকাররমাবাসীগণ হাজার হাজার বছর ধরে তায়েফের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল।

তায়েফের সাথে বনু হাশেম গোত্রের আত্মীয়তা ছিল। এ গোত্রকে নবী পাক (স.) মাতুল বংশ বা মাতৃবংশ বলা হয়ে থাকে। হযরত আব্বাছ (র.)-র সাথে তায়েফের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। নবী পাক (স.) মক্কা মুকাররমায় নানান প্রতিকূল অবস্থার সময় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেছিলেন। কিন্তু তায়েফবাসী তাকে সাদরে গ্রহণ না করে বরং বিরূপ তথা আপত্তিকর ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, তায়েফবাসী নবী পাক (স.)-র বিরুদ্ধে মক্কা মুকাররমার বিরুদ্ধাচারণকারীদের পক্ষাবলম্বন করত।

নবী পাক (স.) কর্তৃক মক্কা মুকাররমা বিজয়ের পর অধিকাংশ তায়েফবাসী না খোশ তথা মর্মাহত হয়। মক্কা মুকাররমা বিজয়ের সাথে সাথে জজিরতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপের সমগ্র অঞ্চল নবী পাক (স.)-র নেতৃত্বে মদিনা মুনাওয়ারার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কিন্তু ২/১টি ছোট ছোট শহর সহজে এ নেতৃত্ব মেনে নিতে চাচ্ছিল না। তৎমধ্যে তায়েফ অন্যতম। কিন্তু জজিরতুল আরবের অধিবাসীদের ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ায় স্রোতের মধ্যে তায়েফবাসীও ভেসে যায়।

মক্কা মুকাররমা বিজয়ের পর তায়েফও ইসলামের পতাকাতলে এসে যায়।

তবে তায়েফের কর্তৃত্ব নিয়ে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাতে কিছু সংখ্যক ছাহাবায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তথায় উক্ত শোহদায়ে কেরামগণের কবর শরীফ রয়েছে।

বিগত ১৪ শত বছরের ইতিহাসে তায়েফ কোন সময় রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে বিবেচিত ছিলনা। তবে তায়েফ অঞ্চলে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে তায়েফের অর্থনৈতিক অবদান অবলীলায় স্বীকার করতে হয়।

তুর্কি শাসনামলে মক্কা মুকাররমার তুর্কি গভর্ণর গ্রীষ্মকালীন তায়েফে অবস্থান করতেন। ১৮০২ সালে সৌদি নজদীরা তায়েফ দখল করে। ১৮১৩ সালে মিশরীয় সৈনিকরা তা পুনঃ দখল করে। এতে তায়েফ শহরের বহু অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

অবশেষে এপ্রিল ১৯২৪ সালে শরীফ হোছাইনের সাথে যুদ্ধ করে আবদুল আজিজ বাহিনী তায়েফ দখল করে নেয়।

বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশী প্রবাসীদের অবস্থান সৌদি আরবে বলা চলে। তাদেরকে একমাওয়ালা বলে, বর্তমান সৌদি সরকারের আইনমতে তথাকার সৌদি নাগরিকের মত একামাওয়ালারা সমগ্র সৌদি আরব অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে। কিন্তু হজ্ব ও ওমরাহকারীগণের বেলায় সৌদি আরবের ভিন্ন আইন। তারা শুধুমাত্র মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারা বাদে জেদ্দা শহর পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ পায়। সৌদি আরবের অন্যকোন খানে যাওয়ার আইনগত কোন অধিকার নেই। ফলে গত ২ বছর আগে রমজানের ঈদের ১ দিনপর মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বদরের শোহোদায়ে কেরামের যেয়ারত ও আবওয়ায় মা আমেনার যেয়ারত করে গাড়ি চালকের সাহসিকতার দরুণ সাগর পাড়ের শহর ইয়াম বুথে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলাম। রিয়াদ এয়ারপোর্টে ২ বার প্লাইট বদলানোর সুযোগ হয়েছিল কিন্তু শহর প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়নি ওমরাহ বা হজ্বযাত্রী হওয়ার দরুণ। মক্কা মুকাররমা থেকে মাত্র এক দেড় ঘন্টার পথ সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ শৈল শহর তায়েফে যেতে বারেবারে চেষ্টা করতে থাকি যেয়ারতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু হজ্ব কিংবা ওমরাহকারী বিধায় গাড়িচালক আমাকে তথায় নিয়ে যেতে ভয় পায়।

গত হজ্বের (২০০৭) ২/৩ দিন পর আমার অনুজ পীর ভাই স্নেহের রফিকুল ইসলামের সাথে আলাপ হয় তায়েফ গমনের ব্যাপারে। তিনি বোয়ালখালী আল কুরআন একাডেমির পরিচালক। রফিকুল ইসলাম আমার মতই যেয়ারতের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমনের জন্য অতি উৎসাহিত মনে হলো। তাঁদের একাডেমির প্রাক্তন ছাত্র তথাকার প্রবাসী মোহাম্মদ মোহসিন তাঁর বন্ধু আবদুল্লাহ (উভয়ের বাড়ি সাতকানিয়া) গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলে তায়েফ গমনের জন্য। ফলে আমরা বাদ যোহর তায়েফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। গাড়ীটি নতুন ও মানান সই। ফলে তায়েফ গমনকালে চেক পোস্টে গাড়ী গতি মন্থর করলেও তথাকার পুলিশ গাড়ী

থামাতে বলেনি। যদিওবা প্রবাসীদ্বয় শংকিত ছিল। যেহেতু পুলিশে আটকালে পরে আমরা হজ্বযাত্রীদের কিছু আসে যাবেনা। ক্ষতি যা হওয়ার প্রবাসী যুবকদ্বয়েরই হবে।

ডিভাইডেট হাইওয়ে দ্রুতগতিতে এক শত কিলোমিটারের উপরে গাড়ির গতি ছিল। তায়েফের কাছাকাছি এসে যাওয়ার পর প্রবাসীদ্বয় বামদিকে দেখিয়ে বলল এটি মিকাত মসজিদ। এতে আমি হতচকিত হই। আমার ধারণা ছিল এই মিকাতটি তায়েফ শহরের পরপর হবে। কিন্তু তায়েফের আগে মিকাত পড়ায় নিশ্চিত হই তায়েফ থেকে ফিরার পথে ওমরাহর এহরাম পরতে হবে মিকাত এই মসজিদ থেকে।

উল্লেখ্য, খানায়ে ক্বাবার বিভিন্ন দূরত্বে ৫টি মিকাত রয়েছে এই মিকাতটির নাম "কারনুল মানাযিল"। দেশে এসে গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করে আমার ভুল ভেঙ্গে যায় যেহেতু এ মিকাতটি জীবনে কোন সময় অতিক্রম করিনি বিধায় তায়েফের পর পর মনে হয়েছিল।

যৌবনকাল থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে নিশ্চিত যে, মিকাত অতিক্রম করে পুনরায় ক্বাবা শরীফ প্রবেশ করতে হলে ঐ মিকাত থেকে এহরাম পরে আসতে হবে। মিকাতের অবস্থান আমার অজ্ঞাত থাকায় এহরাম পরা ও ওমরাহ্‌র জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা ঘুর পথে হাইওয়ে অতিক্রম করে তায়েফ পৌঁছি। এতে ঝুঁকিপূর্ণ বন্ধুর পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হয়নি। মহাসড়কটি এমনভাবে ঘুরিয়ে তায়েফ শহর পৌঁছেছে যে, আমরা পর্বত শীর্ষের একটি শৈল শহরে পৌঁছলাম তা পুরাপুরি বুজে উঠতে পারিনি। গাড়ীর ব্যবস্থাকারী ও চালক আবদুল্লাহ আগে ৪/৫ বছর তায়েফে ছিল বিধায় তায়েফ শহর তার নখদর্পণে। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) ইবনে আব্বাসের মাজার শরীফ সংলগ্ন মসজিদে যাই আছরের নামাজ ও যেয়ারতের উদ্দেশ্যে। বিশাল মসজিদ ঝকঝকে তকতকে কার্পেট বিছানো ওজু করতে গিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা অনুভব হচ্ছিল।

আসরের নামাজের পর যেয়ারত করতে এসে এক প্রবীণ আফ্রিকান সৌদি যেয়ারতকারী দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, মসজিদ সংলগ্ন দেওয়ালঘেরা এরিয়ার অভ্যন্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কবর শরীফ। সাথে মোহাম্মদ ইবনে খানফিয়া (র.)-এর কবর শরীফ। যিনি হযরত আলী (ক.)-র পরবর্তী স্ত্রীর আগের স্বামীর সন্তান।

উক্ত প্রবীণ সৌদি বললেন, আবদুল আজিজ বাহিনী তায়েফ দখলকালীন এ মাজার শরীফ ধুলিস্যাৎ করে ফেলে। তারপরও ভিতরে প্রবেশের দরজা ছিল। ৩০ বছর পূর্বে দেওয়াল ঘিরে অদৃশ্য করে দেয়া হয়। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে যেয়ারত করলাম। কিন্তু ছাহাবা শোহদায়ে কেরামের কবর শরীফ সমূহের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর হলনা সৌদি রাজতন্ত্রের কঠোরতার কারণে।

অতপর চালক ও গাইড আমাদেরকে নবী পাক (স.)-র তায়েফ আগমনকালে যেস্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন তথায় নিয়ে যায়। ঐ স্থানটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। তথায় একটি মৃত বৃহদাকারের কুল তথা বরই গাছ রয়েছে। ঐ গাছটি নবী পাক (র.)-এর আমলের বলে জনশ্রুত রয়েছে তথায় একটি ছোট মসজিদ ও দেখতে পেলাম। অতপর প্রবাসীদ্বয় আমাদেরকে তায়েফ শহরের আর এক পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে যায়। তথায় একটি হরিণী মসজিদ আছে। নবী পাক (স.)-র আমলে হরিণের একটি ঘটনা ছিল। উক্ত স্থানে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল বলে প্রবাসীদের কাছে এ মসজিদটি হরিণী মসজিদ হিসাবেই পরিচিত। আরো কিছুক্ষণ তায়েফ শহর ঘুরে ফিরে এক মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়ি। অতপর মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথে মিকাত মসজিদে যাত্রাবিরতি দিই। তথায় এক দোকান হতে এহরামের একজোড়া টাওয়াল খরিদকরতঃ ওজু করে কাপড় পাল্টে এহরাম পরে ওমরাহর নিয়ত করি। তথায়ও হাল শীত অনুভূত হচ্ছিল। রাত ১০টার দিকে মক্কা মুকাররমা পৌঁছে তাওয়াফ সায়ী শুরু করি। তখন তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রীর উপরে।

জীবনে একটি নতুন মিকাত থেকে এহরাম পরে ওমরাহ করতে পেরে আত্মতৃপ্তি অনুভব হচ্ছিল।

হযরত সুলতানুল হিন্দের মাজার কমপ্লেক্স ও সরকারী ব্যবস্থাপনা

গরীবে নেওয়াজ সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রহ.) ভারতের আজমীরে বিশাল মাজার কমপ্লেক্স নিয়ে শায়িত আছেন। ১৯৮০ সাল থেকে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে তথায় যাওয়া-আসা করছি। সব সময় থাকতাম খাদেমগণের ঘরে। খাওয়া-দাওয়া থাকা সবকিছু তাঁরাই করতেন। তাদের আতিথেয়তা সত্যিই প্রশংসনীয়। যেয়ারতের উদ্দেশ্যে আজমীরে গমন করতাম হয়ত মার্চ মাসে অথবা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। কাজেই দেশের মত তথায়ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের কথা চিন্তা করতাম না। এবার প্রথম জুন মাসে অর্থাৎ অত্যধিক গরমের মওসুমে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে আজমীর গমন করতেছি আমরা ৫ জন। ছোট ভাই সাবেক মেয়র মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী পরামর্শ দিল তথাকার গেস্ট হাউসে অবস্থান করতে। উক্ত গেস্ট হাউসে কিছু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ রয়েছে।

সে মতে মাহমুদুল ইসলাম আমরা যেয়ারতে যাচ্ছি বলে সুলতানুল হিন্দের আওলাদ হযরত দেওয়ান সাহেব হুজুরকে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিল। আমরা ভারতে পৌঁছে হযরত দেওয়ান সাহেব হুজুরের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ রক্ষা করি। দিল্লী থেকে আজমীর রওয়ানা হওয়ার রেলের টিকেট ক্রয়ের সাথে সাথে হযরত দেওয়ান সাহেব হুজুরকে তা অবহিত করি এবং তা হল ১২ জুন ২০০৭ মঙ্গলবার শতাব্দী এক্সপ্রেসযোগে। তিনি তাঁর ১ম পুত্র জনাব সৈয়দ নাসির উদ্দিন চিশতী আজমীর রেল স্টেশনে আমাদেরকে স্বাগত জানাবেন তা বললেন এবং এও বললেন গেস্ট হাউসে জানিয়ে রেখেছিলেন আমাদের আগমনের কথা। আমরা যথাসময়ে দুপুর ১টার দিকে রেল স্টেশনে পৌঁছলে জনাব সৈয়দ নাসির উদ্দিন চিশতী রেল স্টেশনে আমাদেরকে স্বাগত জানায়। তিনিসহ দু'টি অটো (বেবী টেক্সি) নিয়ে আমরা ৬ জন মাজারের প্রধান সড়ক দিয়ে গেইটের সম্মুখে পৌঁছে বামদিকে গেস্ট হাউসে চলে যাই। আগে থেকে বলাছিল বিধায় আমাদেরকে দু'টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ প্রদান করা হয়। আমি আর আজিজ সাহেব এক কক্ষে, আলমগীর সাহেব, শামসুর রহমান সাহেব ও মহসীন সাহেব অন্য কক্ষে। আমরা ৩ রাত আজমীরে ছিলাম। ভাড়া দৈনিক একটি ৪৫০ রুপি অন্যটি ৫৫০ রুপি। ঐ সময় আজমীরে তাপমাত্রা দিনে ৪৩/৪৪ ডিগ্রী বা তার উপর হবে। অর্থাৎ প্রচণ্ড গরম। গেস্ট হাউসের বয়দের বললে খাবার রেস্টুরেন্ট থেকে এনে দেয়। তবে গেস্ট হাউস সংলগ্ন একাধিক বড় বড় রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এ তিন রাত গেস্ট হাউসে অবস্থান

করে অনেক অজানা তথ্য জানবার সৌভাগ্য হয় মাজার শরীফের ব্যবস্থাপনা নিয়ে। বারে বারে খাদেমগণের ঘরে অবস্থান করলেও তথায় যে গেস্ট হাউস রয়েছে তা আমার জানা ছিল। তবে এ গেস্ট হাউস খাদেমগণের কমিটি বা কোন সেবামূলক সংস্থা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলে ধারণা ছিল। বস্তুত এ ৩ রাত ৪ দিন গেস্ট হাউসে অবস্থান করে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অজানা তথ্য আয়ত্তে এসে যায়। লেখালেখির জগতে বিচরণ করছি বিধায় যেকোন জায়গায় যে কোন স্থানে জানতে বুঝতে কৌতুহলী হই। এতে আমার সহযাত্রীগণের মধ্যে অনেকে খুশি মনে সহযোগিতা করে আবার অনেকে অপছন্দ করে থাকে।

মূলত ১৯৪৯ সাল থেকে এ মাজার কমপ্লেক্স ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একজন প্রশাসক ছিল। ১৯৫৬ সাল থেকে জওহর লাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ভারতীয় লোক সভার Dargah Khawja Shaheb Act বা DKS Act নামে একটি আইন পাস করা হয়। সেই আইন অনুযায়ী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কমিটি দ্বারা নিয়োগকৃত মাজার কমপ্লেক্স নিয়ন্ত্রিত। কেন্দ্রীয় সরকার একজন উপসচিব মর্যাদার কর্মকর্তা উক্ত আইন মোতাবেক ডেপুটেশনে নিয়োগ দান করেন যার পদমর্যাদা প্রাদেশিক সরকারের ক্ষেত্রে যুগ্ম-সচিব। অর্থাৎ ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের পদবী প্রাদেশিক সরকারের পদবী থেকে এক স্তর উপরে। কেন্দ্রীয় সরকার আজমীরের মাজার কমপ্লেক্সকে শুধু রাজস্থান প্রদেশের চিন্তা না করে সমগ্র ভারতের অধিকার মনে করে বিভিন্ন প্রদেশের লোক নিয়ে কমিটি গঠন করে থাকে।

কমিটি থাকলেও আইন অনুযায়ী "নাজিম" পদবী সরকারী প্রতিনিধি হয়ে মাজার কমপ্লেক্সের যাবতীয় কিছু তদারক করে থাকেন। নাজিমের অধীনে একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট "নাজিম" রয়েছে।

বর্তমানে "নাজিম" ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, দারোয়ানসহ ১৫৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে বিশাল মাজার কমপ্লেক্স তদারক করছেন।

৯ জানুয়ারি ১৯৪৯ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ পর্যন্ত ৩ জন প্রশাসক ছিল। ১ মার্চ ১৯৫৬ হতে আজ অবধি ১৯ জন "নাজিম" দায়িত্ব পালন করে গেছেন ও করছেন। বর্তমান "নাজিম" জনাব আহমদ রাজা। তিনি অত্র নাজিম দায়িত্বে যোগদান করেছেন ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭। দীর্ঘদিন ধরে এ্যাসিস্ট্যান্ট নাজিমের দায়িত্ব পালন করছেন জনাব আবদুল আলীম। তিনি বহু বছর আগে কমিটি কর্তৃক নিয়োগ লাভ করে আজ অবধি দায়িত্ব পালন করে চলছেন। বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হবে জুলাই ২০০৮ ইংরেজীতে। বর্তমান কমিটির প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন জনাব সৈয়দ আবদুল বারী চিশতী। কেন্দ্রীয় সরকার ৫ বছর মেয়াদের জন্য কমিটি গঠন করে দেন।

আমাদের অবস্থান করা গেস্ট হাউসের নিচ তলায় এক পার্শ্বে নাজিম, এ্যাসিট্যান্ট নাজিম অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীর অফিসাদি রয়েছে। তথায় কক্ষ বরাদ্দের কাউন্টার

রয়েছে। ঐ কাউন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। নাজিম, এ্যাসিটেন্ট নাজিম তা কক্ষের দরজায় লেখা দেখতে পেয়ে উভয়ের সাথে আলাপ করি তাদের কক্ষে প্রবেশ করে। তাঁরা উভয়ে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য কী কী তা জানতে কৌতূহলী হওয়ায় উভয়ে আমাকে জানাতে সচেষ্ট হয়। বিশেষ করে নাজিম আহমদ রাজা সাহেব তার পি.এ. ও অন্যান্য কর্মচারীকে ডেকে ছাপানো নানান কাগজপত্র সরবরাহ করে। আমার কক্ষে ঐ সকল কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে বারেবারে নাজিম আহমদ রাজা সাহেব থেকে প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জানতে কৌতূহলী হই। তিনি তাঁর অতি ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে সময় দিতে ন্যূনতম বিরক্তবোধ করেন নি।

নাজিম, এ্যাসিট্যান্ট নাজিম অন্যান্য প্রবীণ কর্মকর্তা-কর্মচারী সাথে আলাপে এবং তাদের সরবরাহ কাগজাদি দেখে এ বিশাল মাজার কমপ্লেক্সের উপর বহু অজানা বিষয় জানবার সুযোগ হয়।

মূলত গেস্ট হাউজটি কমিটির পাশাপাশি ধনী ব্যক্তিগণের দানে নির্মিত হয়। সেখানে ১৭৪টি কক্ষ রয়েছে। তাও আবার 'এ' থেকে 'জি' ব্লক পর্যন্ত ভাগ করা। ১৭টি কক্ষ রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। প্রায় কক্ষ ডবল-সীট হিসাবে। ওরশসহ বছরের মওসুম অনুপাতে কক্ষের ভাড়া কমবেশি হয়ে থাকে। আমাদেরকে দেওয়া কক্ষ দু'টি হোটেলের মত টিভি, ফ্রিজ, টেলিফোন, কার্পেট সমেত আধুনিক সুযোগ সুবিধা না থাকলেও মোটামুটি মানসম্পন্ন। কক্ষ পরিচ্ছন্ন হলেও বাথরুম অতি পরিচ্ছন্ন নয়। পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে নাজিম সাহেবের সাথে আলাপ করলে তিনি তা তাঁর গোচরে আছে বললেন। এও বললেন অতি সত্বর এসব নিয়ে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন।

মাজার কমিটির নিয়মিত দায়িত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হল :

- ❑ বাৎসরিক ওরশ ও অন্যান্য বড় বড় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।
- ❑ মাজারে গিলাপ, ফুল, আগর বাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- ❑ দৈনিক ২ বার গরীব, দুঃখীগণের মাঝে খাওয়ার সরবরাহ।
- ❑ খাবার পানি ও ওজুর পানি সরবরাহ।
- ❑ মাজার শরীফের ভিতর ও অন্যখানে নিয়মিত সংস্কার।
- ❑ ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, দারোয়ান, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলের বেতন ভাতা প্রদান।
- ❑ গরীব এতিমগণের সাহায্য করা।
- ❑ ইউনানী ও হোমিও ডিসপেনসারী পরিচালনা করা।
- ❑ তথায় ফ্রি চিকিৎসার জন্য ঔষধ সরবরাহ করা।
- ❑ গরীব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে বৃত্তির ব্যবস্থা করা।
- ❑ প্রতিষ্ঠিত একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা।
- ❑ বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা।

উপরোক্ত কাজগুলোর পরও গেস্ট হাউস সম্প্রসারণ, মাজার কমপ্লেক্স আধুনিকায়নসহ নানান পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

বর্তমান অথরিটির কাছে মানুষ স্বইচ্ছায় এসে ছোট-বড় অংকের অর্থ দান করে যায় রশিদের মাধ্যমে। মাজার শরীফের দক্ষিণ ও পূর্ব পার্শ্বের বারান্দায় এবং অন্যান্য স্থানে কমিটির পক্ষে নাজিমের নামকরণে অনেক দান বাক্স বসানো আছে। কিন্তু প্রকাশ্যে সেখানে কেউ দান করতে পারেনা খাদেমগণের বাধার কারণে। একথা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হওয়ায় মাজার শরীফের পূর্ব পার্শ্বের বারান্দায় নাজিম কর্তৃক রক্ষিত দান বাক্সে খাদেমগণের দৃষ্টিগোচর হয় মত পরীক্ষা করার জন্য কিছু রুপি দান করতে যাই। এতে একজন খাদেম আমাকে নিষেধ করছেন বাক্সে রুপি না দিয়ে তাঁর হাতে দেওয়ার জন্য। তিনি দেবেন বললেন। আমি তার কথায় কর্ণপাত না করে রুপিগুলো বাক্সে ফেলে দিই। ঐ দৃশ্য অন্য কয়েকজন খাদেম কৌতূহলী হয়ে প্রত্যক্ষ করছিল। পরদিন আবারো ঐ একই বাক্সে কিছু রুপি ফেলতে যাই। যেহেতু ঐ বাক্সের নিকটে কয়েকজন খাদেম সার্বক্ষণিক উপবিষ্ট থাকে। রুপি ফেলবার জন্য দান বাক্সের দিকে যেতেই নিকটস্থ খাদেম দান বাক্সের রুপি ফেলার ছিদ্রের উপর হাত রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিবন্ধকতা করে ঐ বাক্সে রুপি না দেওয়ার জন্য। সাথে সাথে আমার উপর রাগ দেখায় বাক্সে রুপি ফেলছি বলে। এতে রুপি না ফেলে ফিরে আসি।

বর্তমানে মাজার শরীফ কমপ্লেক্সের বাৎসরিক আয়-ব্যয় আড়াই কোটি টাকারও উপরে। ১৫/২০ বছর আগে খাদেম সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫ শত জনের মত। বর্তমানে তা বেড়ে কয়েক হাজার ছেড়ে যাবে।

এও জানতে পারি, মাজার শরীফের গম্বুজের ভিতর থেকে অর্থাৎ শুধুমাত্র মূল মাজার শরীফের ভিতর থেকে বৎসরে কোটি কোটি রুপি আয় হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এ কোটি কোটি রুপির মধ্যে ১০০টি রুপিও নাজিম ফান্ডে জমা হয়না। কিন্তু বাস্তব সত্য হিসাবে এও জানতে পারি, মূল মাজার শরীফের অভ্যন্তরে মাত্র ১০০/২০০ শত রুপির কোন খরচের প্রয়োজন পড়লে তাও নাজিম ফান্ড থেকে করতে হয়। অর্থাৎ মাজার কমপ্লেক্সের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ওরশসহ বিভিন্ন মাহফিলের ব্যয় করা হয়ে থাকে নাজিম ফান্ড তথা প্রশাসনিক তহবিল থেকে।

নাজিম ফান্ড থেকে দৈনিক ফুল, গিলাপ, আগর বাতি, মোমবাতি ইত্যাদির পরও বাৎসরিক ওরশের এন্তেজাম-এর পাশাপাশি ওরশের সময় ও অন্যান্য সময় বিশাল বিশাল আকৃতির ডেক্সি দু'টির রান্না নাজিম পক্ষে তদারক হয়ে থাকে।

নাজিম সাহেব কর্তৃক সরবরাহকৃত বিভিন্ন কাগজপত্র পর্যালোচনা করে আরো জানতে পারি সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী আজমীরি (রহ.) পারস্যের (বর্তমানে ইরান) শিস্তান প্রদেশের সঞ্জর এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন হাসান এবং হযরত সৈয়দা উম্মুল-ওয়ারা এর গর্ভে ১৮ এপ্রিল ১১৪৩ ইংরেজী ৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ১৩ বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। তিনি বুখারা, সমরখন্দসহ ঐতিহাসিক শহরসমূহ ঘুরে মক্কা মুকাররমা পৌঁছেন। অতপর মদিনা মুনাওয়ারা গমন করে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ৫২ বছর বয়সে এ উপমহাদেশের আজমীরে আসেন।

তিনি লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানকে পবিত্র ইসলাম ধর্মের আলোয় আলোকিত করে ১১ মার্চ ১২২৩ ইংরেজী, ৬ রজব ৬৩৩ হিজরী ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তবে তিনি তাঁর হুজরা শরীফের দরজা বন্ধ অবস্থায় ৬ দিন অতিবাহিত করেন। ৬ রজব তাঁর ইন্তেকালের কথা জানা যায়। এতে তাঁর ইন্তেকাল ১ থেকে ৬ রজবের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন্‌দিন হয় তা অস্পষ্ট। অতএব ১ থেকে ৬ রজব এই ৬ দিনই তাঁর ওফাতবার্ষিকী পালিত হয়ে থাকে।

❑ সুলতান মাহমুদ খিলজী ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে বুলন্দ দরজা নির্মাণ করে দেন যার উচ্চতা ৮৫ ফুট।

❑ মাজার কমপ্লেক্সের প্রধান গেইটটি হায়দরাবাদের নিজাম ওসমান আলী খান নির্মাণ করে দেন ১৯১২ থেকে ১৯১৫ সালে। যার উচ্চতা ৭০ ফুট।

❑ মোঘল বাদশাহ শাহজাহান তাঁর নামকরণে শাহজাহানী দরজা নির্মাণ করে দেন ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে।

❑ মোঘল বাদশাহ আকবর লাল পাথর দিয়ে তাঁর নামকরণে আকবরী মসজিদ নির্মাণ করে দেন ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে। এ মসজিদের গম্বুজের উচ্চতা ৫৬ ফুট।

❑ বাদশাহ শাহজাহান তাঁর নামকরণে শাহজাহানী জুমা মসজিদ নির্মাণ করে দেন ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে। দৃষ্টিনন্দন এ মসজিদটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল ১৪ বছর। তখনকার আমলে ২ লক্ষ ৪০ হাজার রুপি ব্যয় হয়েছিল এ মসজিদ নির্মাণে।

❑ সুলতান মাহমুদ খিলজী ১৪৫২ খ্রিস্টাব্দে সান্ডেলখানা মসজিদ নির্মাণ করেন। মোঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও মোঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব এ মসজিদ সংস্কার করেন।

❑ ভারতের বিহার অঞ্চলের কাটিহার এরিয়ার খান বাহাদুর চৌধুরী মোহাম্মদ বক্স ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে আউলিয়া মসজিদ নির্মাণ করে দেন।

❑ সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহান আরা মাজার শরীফের পূর্বপার্শ্বে বেগমী দালান নির্মাণ করে দেন ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে।

❑ হায়দরাবাদের নবাব বশীরউদ্দৌলা ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে মাহফিলখানা নির্মাণ করে দেন। ওরশের সময় এ মাহফিলখানায় ছে'মা অনুষ্ঠিত হয়।

❑ বিশ্বের বহু রাজা-বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীগণের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৯১১ সালে মাজার শরীফে আসেন।

❑ বুলন্দ দরজার পশ্চিম পার্শ্বে বিশাল আকৃতির ডেক্সিটি বাদশাহ আকবর ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত করে দেন। উক্ত ডেক্সিতে ৩৭ কুইন্টাল অর্থাৎ ৩,৭০০ কেজি পরিমাণ তবরুক রান্না করা যায়।

❑ বুলন্দ দরজার পূর্ব পার্শ্বে মোঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে অপর বিশাল ডেক্সিটি প্রস্তুত করে দেন। উক্ত ডেক্সিতেও ২৯ কুইন্টাল অর্থাৎ ২,৯০০ কেজি তবরুক রান্না করা যায়।

❑ লঙ্গরখানায় দরগাহ কমিটি কর্তৃক নাজিমের তত্ত্বাবধানে সকাল-বিকাল গরীব-দুঃখীগণের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়ে থাকে।

❑ মাজার শরীফের চাবি স্থানীয় ৭ সম্ভ্রান্ত পরিবারের কাছে পালাক্রমে রক্ষিত আছে বিগত ৪/৫ শত বছর বা আরো অধিককাল ধরে। এ সাত পরিবার একদিন করে ৭ দিন বাদে এশা মাজার শরীফ বন্ধ করে ভোররাতে খুলে থাকে।

দীর্ঘ মামলা-মোকদ্দমার পর হযরত সৈয়দ ইলমুদ্দিন (১৯৭৪ সালে ইন্তেকাল করেন) এরপর সুযোগ্য পুত্র হযরত সৈয়দ জয়নুল আবদীন, আলী খান উপাধি লাভ করে দেওয়ান হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেন ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ তিনি হযরত গরীবে নেওয়াজ এর আওলাদ হিসাবে মাজার শরীফের দেওয়ান তথা সাজ্জাদানশীন বা ধর্মীয় মুরুব্বি। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার বাদে এশা বিশেষ মাহফিল-এর নেতৃত্ব দেন মাজার শরীফের পূর্ব চত্বরে। উক্ত মাজার কমপ্লেক্সের সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সাজ্জাদানশীন বা দেওয়ান হিসাবে তিনি ছদারতী করেন। ভারতের বিভিন্ন দরগাহসমূহে ওরশের সময় বরকতের জন্য অত্র দরগাহের সাজ্জাদানশীন বা খাজা সাহেবের আওয়ালাদের পক্ষ থেকে দেওয়ান সাহেবকে প্রধান মেহমান হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে।

নাজিম মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষে তথা নাজিম-এর পক্ষে এ মাহফিলের যাবতীয় এন্তেজাম ও ব্যয় করা হয়। শত শত বছর ধরে খাদেমগণ মাজার শরীফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। মূল খাদেমগণ ইন্তেকাল হতে হতে বর্তমানকালে তাদের সন্তান-সন্ততিরা খাদেম। তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার হবে। তাঁরা তাঁদের দালানে সম্মানিত যেয়ারতকারীগণকে অবস্থানের লক্ষে তাদের ঘরে তওফিক অনুযায়ী কক্ষাদি রেখেছেন। তাদের ঘরে অবস্থানরত যেয়ারতকারীগণকে সকালে চা-নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার তাদের ঘর থেকে সরবরাহ করে থাকে।

উপমহাদেশের মধ্যে হযরত খাজা সুলতানুলহিন্দের মাজারে ওরশ ও বিশেষ মাহফিল বাদে দৈনিক যেয়ারতকারী আসতে থাকে। অসংখ্য খাদেমগণের পক্ষ থেকে তাদের ঘরে আবাসন ব্যবস্থা না থাকলে দৈনিক হাজার হাজার যেয়ারতকারী যেয়ারতে গমন করে অবস্থানের জন্য বিড়ম্বনায় পড়তে হবে তাতে ইতস্ততার অবকাশ নেই।

তবে খাদেম নিয়ে মাজার শরীফকে কেন্দ্র করে টাকা পয়সা লেনদেনের ব্যাপারে যে দুর্নাম রয়েছে তা থেকে তাদের সজাগ হওয়া আবশ্যক মনে করি।

মাজার শরীফ কমপ্লেক্সে তিন মসজিদে ৩টি নামাজের জামায়াত হয়ে থাকে। প্রথমে মাজার শরীফ উত্তর সংলগ্ন সুলতানী মসজিদ, অতপর বাদশাহ শাহজাহানী মসজিদ, অতপর বাদশাহ আকবর মসজিদ। কিন্তু জুমার দিন শাহজাহানী মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে জামাত হয় অতপর আকবরী মসজিদে। সেই অনাদিকাল থেকে সেখানে জুমার খোৎবার ও নামাজের পূর্বে বিকট শব্দে তোপধ্বনি করা হয়ে থাকে। এটা জ্ঞানীদের জন্য চিন্তার বিষয়।

নাজিম কমিটির ব্যবস্থাপনায় যেয়ারতের পাশাপাশি জামায়াতের সুন্দর ব্যবস্থাপনা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

কলকাতা নগরীতে দু'মহান শহীদের যেয়ারত

কলকাতা নগরীতে চিরনিদ্রায় পাশাপাশি শায়িত আছেন দু'মহান যুবক শহীদ। এ যুবকদ্বয় শহীদ হওয়াকে মনেপ্রাণে বেছে নেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলতে হয় বিগত চৌদ্দশত বছর আগে নবী পাকের (স.) ওফাতের পর থেকে মুসলমান নামধারী কিছু নাস্তিক মুরতাদ নবিজীর নামে কুৎসা রটনা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তেমনিভাবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে থেকেও কখনো কখনো নবী পাকের (স.) কুৎসা রটনা করছিলো বারেবারে। এমনকি গোপনে মদিনা মুনাওয়ারা পৌছে সন্ত্রাসী কাণ্ড ঘটাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় বারেবারে। অপরদিকে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নবী পাকের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান দেখাতেও দেখা যায়।

ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তা পরিস্কার হয়ে যায়। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কর্তৃক লিখিত বিশ্বের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ একশত ব্যক্তিগণের মধ্যে নবী পাক (স.) এক নম্বরে স্থান রয়েছে।

মূল কথায় ফিরে আসি। ব্রিটিশের দুর্দান্ত প্রতাপের সময় কলকাতা থেকে এক জঘন্য মানব নামের কলংক ১৯২০-এর দশকে 'রঙ্গিলা রসূল' নামে এক বই লিখে তা প্রকাশ করে। নবী পাকের (স.)-এর পবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপনই ছিল এ বই লিখার উদ্দেশ্য। এই বই লিখে ও প্রকাশের সাথে সাথে ভারতবর্ষে নবী-প্রেমিকগণের মনে দারুণ আঘাত লাগে। তেমনি আঘাত লাগে অবিভক্ত পাঞ্জাবের দুই নবীন যুবকের। তাদের একজনের নাম আমির আহমদ, বয়স মাত্র ২১ এবং অপরজনের নাম আব্দুল্লাহ খান, বয়স মাত্র ১৯। উভয়ে এক মায়ের সন্তান এবং লাহোরের অধিবাসী। মতান্তরে আমীর আহমদ অমৃতসরের এবং আব্দুল্লাহ খান লাহোরের ও দু'মায়ের সন্তান।

স্বাধীনচেতা নবী-প্রেমিক এ নবীন যুবকদ্বয় কলকাতা থেকে লিখিত ও প্রকাশিত রঙ্গিলা রসুল নামে বই-এর কথা জানতে পেরে নিজেদের ভবিষ্যত জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে রেলযোগে চলে আসে কলকাতায় এবং নগরীর কোন এক স্থানে অবস্থান নেয়। খুঁজে বের করে ঐ কুখ্যাত লেখক ও প্রকাশককে এবং প্রকাশ্যে হত্যা করে। কিন্তু না 'রঙ্গিলা রসুলের' লেখক ও প্রকাশককে হত্যা করে জীবন রক্ষার জন্য তারা পালিয়ে যাননি বরং জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে সংবাদ পাওয়া মাত্র পুলিশ এসে তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

গ্রেফতারকালে যুবকদ্বয় বারেবারে বলতে থাকে তাঁরা সুস্থ মস্তিস্কে এ জঘন্য নবী পাকের দুশমনকে হত্যা করতে পেরে গর্বিত যাতে করে ভবিষ্যতে যে কোন লেখক নবী পাকের বিরুদ্ধে কলম ধরতে ভয় পায়। তখনকার আমলে বিখ্যাত

রাজনীতিবিদ ও স্বনামধন্য আইনজীবী শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকসহ বেশ কয়েকজন আইনজীবী জেলে গিয়ে যুবকদ্বয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে কথা বলেন যাতে করে তাঁরা ছাড়া পেতে বা সাজা কাটিয়ে লঘু শাস্তি হয়। কিন্তু না, নবীন যুবকদ্বয় অবিচল, অটল। তাঁরা জেলে আবদ্ধ থাকার পরও জীবনের প্রতি ন্যূনতম তোয়াক্কা নেই এবং বারেবারে বলতে থাকে সুস্থ মস্তিষ্কে খুশিমনে তাঁরা এ কাজ সম্পন্ন করেছেন। অতএব মিথ্যাতো নয়ই, রাগের মাথায় হিতাহিত জ্ঞান শুন্যভাবে হত্যা করেছে একথা বলারও তাদের কোন ইচ্ছা নেই এবং শেষ পর্যন্ত আদালতে তাই বারেবারে বলে গেছেন। অতএব আদালতের রায়ে ১৯৩২ সালের ৯ মার্চ গভীর রাতে এ মহান যুবকদ্বয়ের ফাঁসী কার্যকর করা হয়। তারপর শহীদদ্বয়কে কলকাতা নগরীর গোবরা কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

এ ইতিহাস কিছুটা জানা থাকলেও ধারণা ছিল বৃটিশের দুর্দণ্ড প্রতাপের সময় শহীদদ্বয়ের কবরের হদিশ না থাকারই কথা। কিন্তু জানতে পারলাম নবী-প্রেমিক অনেকে শহীদ হতে না পারলেও অন্তত এ শহীদদ্বয়ের কবর শরীফকে সযত্নে সংরক্ষণ করে চলেছেন। কলকাতা নগরীর গোবরা কবরস্থানে মহান শহীদদ্বয়ের কবর শরীফ বিদ্যমান তা জানার সাথে সাথে মন উতলা হয়ে যায় কলকাতা গমন করতে এবং এ মহান শহীদদ্বয়ের কদমে দাঁড়িয়ে সালাম করতে।

পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার মানিকতলা এবং ফুরফুরা ও বান্ডেলে গিয়ে বারেবারে যেয়ারত করেছি। এবারে মনমানসিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনিতে শারীরিক কিছু চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নতুন চালু হওয়া এ্যাপেলো হাসপাতালে যেতে হচ্ছিল। যদিও চিকিৎসা উদ্দেশ্য তা কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে। মনের গভীরে নিয়ত করা আছে গোবরা কবরস্থানে গিয়ে আগে এ মহান শহীদদ্বয়ের কদমে দাঁড়াব এবং সালাম পেশ করব। তারপর চিকিৎসা। এরিমধ্যে ভ্রাতা সমতুল্য ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক আলমগীর সাহেব স্ত্রী, পুত্রসহ এবং তার দু'বন্ধু শামসুর রহমান ও মোহসিনসহ আমরা ক'জন গত ২২ জুন (২০০৪) মঙ্গলবার কলকাতা পৌছি। সবাই রোগী। কলকাতার বাসিন্দা অমলেন্দু বাবু আমাদের যাবতীয় দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। পরদিন সবাই চাচ্ছিল সকালবেলা এ্যাপোলো হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা কাজ শুরু করে বিকেলে যেয়ারত করার।

বললাম তা হয় না। আমার আগে যেয়ারতে যেতে হবে। অমলেন্দু বাবু গোবরা কবরস্থানের পরিচয় জানিয়েছেন এবং আমি, শামশুর রহমান সাহেব ও মোহসিন সাহেব গোবরাতে চলে যাই। অমলেন্দু বাবু, আলমগীর সাহেব ও তাঁর স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে এ্যাপোলো হাসপাতালে যায় সকাল বেলা। অমলেন্দু বাবুর দিকনির্দেশনা নিয়ে বিশাল কলকাতা নগরীর পার্ক সার্কাস, চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের নিকটে গোবরা (১) এতে পৌছে যাই। বিশাল কবরস্থানের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই তথায় অবস্থানরত লোকজন দেখিয়ে দিল। গেইট পার হয়ে ১০/২০ ফিট ভিতরে উঁচুভাবে ছোট আকৃতির মাজার। মাজারের ভিতরে নবীন শহীদদ্বয় পাশাপাশি শায়িত। তথায় দাঁড়িয়ে সালাম করতে গিয়ে

বারেবারে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। নিজে নবী-প্রেমিক নামধারী বাদে কিছুই নয়। না হয় বাংলার জীবনে জন্মসহ জবিনে কাটিয়েও এবং কলকাতা বারেবারে গিয়েও এ মহান শহীদদ্বয়ের কদমে দাঁড়াতে এত বিলম্ব অগ্রহণযোগ্য অশোভনীয়। জানিনা তা মার্জনীয় হয় কিনা। মহান শহীদদ্বয়ের কবর শরীফে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ ও দোয়া দরুদ পড়লাম। তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করে বিশাল গোবরা কবরস্থানের অন্যান্য ওলি, মুর্দ্দাগণের কবর যেয়ারত করি।

অতপর কবরস্থানের উত্তর পার্শ্বে বাউন্ডারী সীমানার বাইরে হযরত সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহ.) এর মাজার যেয়ারত করতে যাই। তিনি হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়েসী (রহ.)-এর অন্যতম খলিফা হন।

তাঁর খলিফা হযরত ইউনুচ আলী এনায়েতপুরী (রহ.), তাঁর খলিফা আটরশী বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের হযরত হাসমতউল্লাহ (রহ.) ও চন্দ্রপাড়ার হযরত সুলতান আহমদ (রহ.) (দেওয়ান বাগের পীর সাহেবের শ্বশুর ও পীর)। অতপর সাথীকে নিয়ে এ্যাপোলো হাসপাতালে চলে যাই।

কলকাতায় যেয়ারত ও গ্রন্থ প্রকাশ

আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কলকাতা নগরী বুঝতে বিনোদন ও চিকিৎসা লাভের নগরী বুঝে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে এমন সংখ্যাও কম নয় যারা, কলকাতা নগরী বুঝতে যেয়ারতের নগরী বুঝে থাকেন। যারা শুধুমাত্র কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গে গমন করে থাকেন যেয়ারতের উদ্দেশ্যে।

কলকাতা মহানগরীতে অনেক মহান ওলি, শহীদ চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। সাথে সাথে হুগলীর বান্ডেল, ফুরফুরা, বর্ধমানের মঙ্গলকোর্ট, মালদহ-এর গৌড়, পান্ডুয়াসহ পশ্চিমবঙ্গের এমন কোন জেলা নেই যে জেলায় কোন না কোন মহান ওলি শহীদানে কেরাম শায়িত নয়।

মূলত আরব, পারস্য হতে মহান ওলিগণ পশ্চিমবঙ্গ হয়ে সাবেক পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশে আগমন করেন।

নিজের যেয়ারতের উদ্দেশ্যে বহুবার ভারতে গমন করার সুযোগ হয়েছিল। তৎমধ্যে একাধিকবার শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ গমন করেছিলাম যেয়ারতের উদ্দেশ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্যস্থান বাদে শুধু কলকাতা নগরীতে ন্যূনতম পক্ষে দুইটি স্থানে যেয়ারতে গমন করতে তৎপর থাকি। আর তা হল : পার্ক সার্কাস চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের নিকটে গোবরা-এক কবরস্থান ও মানিকতলা রসূলনোমা হযরত সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহ.)'র মাজার। অবশ্য হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (রহ.), হযরত মাওলানা আজানগাছি (রহ.), হযরত সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহ.), হযরত আফজল কলন্দর (রহ.), হযরত মাওলানা দিদার বক্স (রহ.), হযরত শেখ কোরবান আলী (রহ.) সহ এ সকল মহান আওলিয়ায়ে কেরামগণের যেয়ারত করার সুযোগ হয়েছিল।

কলকাতা গমন করলে সুযোগ পেলেই হুগলীর বান্ডেলে গমন করি যেয়ারতের উদ্দেশ্যে। হাওড়ার বিশাল রেল স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে মাত্র ১ ঘন্টার যাত্রা বান্ডেল রেলওয়ে জংশন। রেল স্টেশনের অতি নিকটে মহান ওলি আওলাদে রসুল হযরত সৈয়দ আব্দুল বারী (রহ.)-এর কবর শরীফ। তবে পশ্চিমবঙ্গের ফুরফুরায়, বর্ধমানের মঙ্গলকোর্ট, মুর্শিদাবাদের মুর্শিদাবাদ, পুনাশী, শাহপুর, মালদহের গৌড় পান্ডুয়া গমনের সুযোগ হয়েছিল যেয়ারতের উদ্দেশ্যে।

কলকাতার মানিকতলায় শায়িত মহান ওলি রসুলনোমা হযরত সূফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহ.)-এর জন্মস্থান আমাদেরই চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলায়। তিনি আমাদের ত্বরীকতের সিলসিলার অগ্রজ। ভারতে তাঁর উপর রচিত বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে প্রবন্ধ বাদে তাঁর

উপর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। ফলে এ মহান আশেকে রসুল (স.)-এর উপর 'শানে ওয়াইসী' নামকরণে একটি গ্রন্থ রচনা করার সৌভাগ্য হয় আমার এবং তা ২০০৫ সালে চট্টগ্রাম মহানগরীতে একটি প্রকাশনা মাহফিলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

উক্ত প্রকাশনা মাহফিলে কলকাতা থেকে ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ড. শেখ আহমদ আলী অতিথি হিসাবে যোগদান করেছিলেন। তিনি কলকাতা ফিরে যাওয়ার সময় শানে ওয়াইসীর কিছু কপি সাথে করে নিয়ে যান।

হযরত ওয়াইসী (রহ.)-এর উপর ভারতে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ প্রকাশিত থাকলেও এ মহান ওলির উপর বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আলোচ্য শানে ওয়াইসী গ্রন্থটি অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ হওয়ায় তথায় সমাদৃত হয়। ড. শেখ আহমদ আলী সাহেব ভারত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে শানে ওয়াইসী প্রকাশের আগ্রহ দেখে লেখক হিসাবে সম্মতি জ্ঞাপন করি। ফলে তিনি শানে ওয়াইসী ইংরেজি অনুবাদ করে তা ছাপানোর ব্যবস্থা করেন।

গত ০৪ জুন ২০০৭ কলকাতা গমন করলে ড. শেখ আহমদ আলী সাহেবের অতি আগ্রহে মানিকতলায় হযরত ওয়াইসী (রহ.) মাজার চত্বরে শানে ওয়াইসী ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনের ব্যবস্থা করেন। তথায় ভারতীয় অতিথিগণের সাথে আমি অত্র গ্রন্থের লেখকসহ ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মোহাম্মদ আলমগীর আলম এবং শমসুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, রসুলনোমা হযরত সূফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহ.) যৌবনের প্রারম্ভে চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। তিনি মুর্শিদাবাদে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেন। তবে কলকাতা আলীয়া মাদরাসার নিকটতম স্থানে জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ কাটান। তিনি ইন্তেকাল করলে কলকাতা নগরীর মানিকতলার মুন্সিপাড়া লেনে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। সকাল-বিকাল তাঁর মাজারে যেয়ারতকারীগণের যাওয়া-আসা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের পান্ডুয়ার মহান অলি নূর-কুতবুল আলম (রহ.)

হযরত নূর কুতবুল আলম ছিলেন এ উপমহাদেশের একজন মহান সাধক-মনীষী। তিনি প্রসিদ্ধ সাধক ও মহান অলি হযরত শেখ আলাউল হক (রহ.)-এর যোগ্য পুত্র এবং আধ্যাত্মিক শক্তি ও জ্ঞান-সম্পদের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। তিনি গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ (১৩৭৭-১৪১০)-এর সহপাঠী ছিলেন। শৈশবকালেই পিতা তাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় দীক্ষা দান করেন। কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠায় ও সাধক জীবনের কৃচ্ছসাধনে তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হয়েও পিতার নির্দেশে তাঁকে ফকির ও ভিখারীদের পোশাক ধৌত করতে, অযুর জন্য গরম পানি সর্বদা তৈরী এবং খানকাহ ও সংলগ্ন গোসলখানা পর্যন্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হতো। একদিন এক দুর্বল ভিখারীকে পায়খানায় যেতে সাহায্য করার সময় তাঁর কাপড় ও শরীর নাপাক হয়ে যায়। তাঁর এ অকুণ্ঠ সেবা দেখে পিতা খুশী হয়ে তাঁকে লংগরখানার জ্বালানি কাঠ বহনের ভার দেন। তাঁর ভাই আযম খান ছিলেন সুলতানের উজীর (মন্ত্রী)। এরূপ সাধারণ এক চাকরের কাজ করতে দেখে একদিন তিনি হযরত নূর কুতবুল আলমকে জাঁকজমকপূর্ণ আরাম-আয়েশের জীবনে চলে আসার আনুরোধ করেন। কিন্তু হযরত নূর কুতবুল আলম সবিনয় নিবেদন করে জানালেন শাহী দরবারের জাঁকজমক ও বিত্তশালী জীবন অপেক্ষা খানকার জ্বালানি কাঠ বহনের জীবনই তাঁর অধিকতর কাম্য।

জ্ঞানের একনিষ্ঠ অনুশীলন এবং সূফী সাধনা ও ধর্মচর্চায় সকল দিকে বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তি লাভের দ্বারা তিনি পিতার আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞানসম্পদ সমৃদ্ধতর করেন। সূফী তরীকাকে আরো উন্নত ও সুসংগঠিত করে তিনি প্রচারের ব্রতে মননশীলতা এবং মানব সেবায় নতুন প্রাণ ও উৎসাহের সঞ্চার করেন। ফলে পান্ডুয়া ভারতবর্ষে ধর্ম ও কৃষ্টি জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ও শক্তিশালী কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। হযরত সূফী নূর-কুতবুল আলম (রহ.)-এর খ্যাতি ভারতবর্ষ পেরিয়ে আরো বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও ছাত্র এবং ভক্ত সাধকগণকে আকৃষ্ট করতে থাকে। তাঁর শিষ্য ও ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত হন মধ্য প্রদেশের মানিকপুরের হযরত হুসামুদ্দীন (রহ.) (ইন্তেকাল ১৩৭৭ ইং), লাহোরের হযরত শেখ কাফু (রহ.) (ইন্তেকাল ১৪৭৬ ইং) এবং রাজস্থানের আজমীরের হযরত শামশুদ্দীন (রহ.) (ইন্তেকাল ১৪৭৬ ইং।) হযরত নূর কুতবুল আলম (রহ.) ওয়াহ্দাতুল উজুদ (একত্বের মূলতত্ত্ব) সম্বন্ধে মুরিদ ও ভক্তদের পত্র লিখতেন। এসব পত্রে তাঁর আধ্যাত্মিক এবং মরমী জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়। তাঁরই পরিচালনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় মাদরাসা, হাসপাতাল,

লংগরখানা প্রতিষ্ঠিত হয় জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে। এসব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের জন্য সূলতান হুসাইন শাহ বহু লাখেরাজ তথা নিস্কর ভূমি দান করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানগণকে ঐক্য সাধনে তৎপর ছিলেন এবং তাঁরই রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে রাজাবংশের পুত্র যদু মুসলমান হন এবং পরে সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নামে বাঙলার সিংহাসনে বসেন। এ মহান আল্লাহর ওলি ১৪৪৭ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মহান পিতা হযরত শেখ আলাউল হক (রহ.)ও এক মহান আল্লাহপাকের ওলি ছিলেন তা মহানপুত্র হযরত কুতবুল আলম (রহ.)-এর জীবনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে অনায়াসে বুঝা যায়।

গৌড়ের এক বিত্ত ও প্রভাবশালী পরিবারে হযরত শেখ আলাউল হক (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। বংশ ও বিত্তের আভিজাত্যের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের যোগ হওয়ায় হযরত আলাউল হক (রহ.) একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেন। হযরত শেখ সিরাজ (রহ.) এর মুরিদ হয়ে ঐশ্বর্য, প্রভাব ও বংশের মান মর্যাদা ত্যাগ করে সেবা ও কৃচ্ছ্রতা সাধনের জীবনে তিনি একনিষ্ঠ ও কর্মতৎপর হন। সেবা ও নিষ্ঠার দ্বারা তিনি পীরের প্রীতিভাজন হয়ে তাঁর খেলাফত লাভ করেন। পীরের ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর ব্রত ও আধ্যাত্মিক সাধনা অব্যাহত রাখেন। তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিস্ময়কর মনীষার জন্য পাণ্ডুয়াতে সেই মধ্যযুগে ধর্মীয় ও মানসম্পন্ন জীবনের যেমনি কেন্দ্র হয়ে উঠে তেমনি সারা ভারতবর্ষে খ্যাতিলাভ করে। তাঁরই প্রিয় মুরিদগণের মধ্যে স্বীয় পুত্র হযরত নূর কুতবুল আলম (রহ.) সহ হযরত জাহাঙ্গীর সিমমানী (রহ.) ও পুর্ণিয়ার বিখ্যাত ওলি হযরত হুসাইন (রহ.) অন্যতম। মহান আল্লাহর ওলি হযরত শেখ আলাউল হক ১৩৯৮ সালে ইন্তেকাল করেন। পিতা হযরত আলাউল হক (রহ.) ও পুত্র হযরত নূর কুতবুল আলম (রহ.) পিতা-পুত্র উভয়ে ঐতিহাসিক সুলতানী আমলের শত বছরের রাজধানী পাণ্ডুয়াতে চিরনিদ্রায় শায়িত।

এ পাণ্ডুয়াতে আরো রয়েছে বিশ্বখ্যাত ধর্ম প্রচারক পারস্যের হযরত সৈয়দ মখদুম শাহ জালাল তীবরেজীর চীল্লার স্থান। ১৪৫৮ সালে সুলতান শামসুদ্দীন ইউছুফ শাহ চীল্লার স্থানে দরগাহ তৈরী করে দেন। সাথে তিন গম্বুজের মসজিদ। পানির উপর দিয়ে হেঁটে গঙ্গা নদী পার হন বলে জানতে পেরে রাজা লক্ষণ সেন তাঁকে অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করেন এবং রাজা লক্ষণ সেন তখনকার আমলের বাইশ হাজার টাকার আয়ের উপযোগী জমি হযরত সৈয়দ মখদুম শাহ জালাল তীবরীজী (রহ.)-কে দান করেন। তাঁর এ চীল্লার স্থানে তাঁরই শীষ্যত্ব লাভ করে বহু মুসলমান কামালিয়াত হাসিল করেন। চিল্লা সংলগ্ন ও নিকটতম স্থানে আজও একাধিক আল্লাহর ওলিসহ বহু মুসলমান চিরনিদ্রায় শায়িত।

চুনতী হযরত শাহ সাহেব (রহ.)

আশেকে রসুল (স.) মুজাদ্দেদে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) হযরত আলহাজ্ব মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) প্রকাশ চুনতী শাহ সাহেব (রহ.) ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ১৪০৪ হিজরী ২৩ সফর ইন্তেকাল করেন। তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিখ্যাত চুনতী গ্রামে এক বুনিয়াদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (মতান্তরে ১৯০৭ইং)। তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত ওমর (রা.)-এর বংশধর। তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ, দাদার নাম কাজী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। তাঁর পূর্বপুরুষ হযরতুল আল্লামা শাহ আলম আল মহাজির-আল মুবাল্লিগ-আল আরবী পবিত্র আরবভূমি থেকে চট্টগ্রামে আগমন করেন। চট্টগ্রাম আনোয়ারা উপজেলার গহিরা গ্রামে সাময়িক অবস্থান নেন। তথা হতে বাঁশখালী উপজেলার কালীপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হযরত ইব্রাহিম খন্দকার এই চুনতী গ্রামে বসতি স্থানান্তর করে বসবাস করেন। তাঁর পুত্র মোহাম্মদ আবদুর রশীদ তালুকদার তাঁর পুত্র মোহাম্মদ আব্দুল গণী সিকদার তাঁর পুত্র সুফী মোহাম্মদ মুকিম, তাঁর পুত্র মুন্সী কাশেম আলী। মুন্সী কাশেম আলীর ২ পুত্র ১ কন্যা। ১. হযরত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) (হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর দাদা) ২. মুন্সী ওয়াহেদ আলী (খানবাহাদুর মোহাম্মদ হাসান সাহেবের পিতা)। মুন্সী কাশেম আলী সিকদারের একমাত্র মেয়ে মোছাম্মৎ ফরহাতুন্নেছা খাতুনের স্বামী খানবাহাদুর ওয়াজিউল্লাহ (সামী)।

শাহ সাহেব (রহ.)-এর দাদা কাজী মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) আকিয়াবের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদকে নিয়ে ১৯০৭ সালে হজ্বব্রত পালন করতে গমন করেন। তথায় হজ্বের পর কাজী মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ইন্তেকাল করেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বাল্যকালে স্বীয় পিতা ও যোগ্য অগ্রজগণের আদর-যত্নে লালিত হন। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। সাতকানিয়া আফজল নগর মাদ্‌রাসায় জমাতে হাপ্তুম পর্যন্ত লেখাপড়া সমাপ্ত করেন, অতপর বাঁশখালী ছনুয়া মাদ্‌রাসায় চলে যান। তখন ঐ মাদ্‌রাসার প্রধান ছিলেন হযরত আজমগড়ী (রহ.)-এর অন্যতম প্রবীণ খলিফা চুনতী নিবাসী হযরত মাওলানা ফজলুল হক (রহ.)। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হযরত মাওলানা ফজজুল হক (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে ১ বৎসরকাল পর্যন্ত শিক্ষালাভ করে চট্টগ্রাম শহরস্থ দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় চলে আসেন। তথা হতে তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় গিয়ে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন।

দেশে এসে তিনি দাম্পত্য জীবনে পা বাড়ান। তিনি তাঁর আপন চাচা হযরত মাওলানা রশির আহমদ (রহ.)-এর প্রথমা কন্যা মোছাম্মৎ মাহমুদা খাতুনের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর তিনি কিছুদিন চকরিয়া ইলিশিয়ায় তাঁর নানাশ্বশুর খান সাহেব মকবুল আলী চৌধুরীর জমিদার বাড়ী জামে মসজিদে ইমামতি করেন। তাঁর পুত্র শাহ জামাল আহমদের জন্মের পর কিছুদিন মজজুব হালতে ছিলেন। হযরত আজমগড়ী (রহ.) বাৎসরিক একবার চুনতীতে তশরীফ নিলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর বাড়ীতে অবস্থান নিতেন। হযরত আজমগড়ী (রহ.) ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে কর্মস্থল আকিয়াবে অবস্থানকালে হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর আপন জেঠা হযরত মাওলানা ফয়েজ আহমদ (রহ.) পিতার জমিদারী দেখাশুনার সুবাদে হযরত আজমগড়ী (রহ.)-এর সাথে পরিচিত হন। এতে করে তাঁর প্রতি অতি আকৃষ্ট হয়ে মুরীদ হয়ে যান। হযরত আজমগড়ী (রহ.) ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে আকিয়াব গমনকালে চট্টগ্রামে অবস্থানকালে তরীকতে তাবলীগের খেদমত করতেন। ঐ সময় হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর জেঠা হযরত মাওলানা ফয়েজ আহমদ তাঁর শ্রদ্ধাভাজন পীর সাহেবকে তরীকতে তাবলীগে সফরের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহর থেকে চুনতীতে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন নদীপথে। পরবর্তীতে রেলপথে দোহাজারী হয়ে। এ সফর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত নিয়মিত জারী ছিল।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) শাহ জামাল আহমদের জন্মের পর কিছুদিন মজজুব হালত হলে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। ঐ সময় হযরত আজমগড়ী (রহ.) তশরীফ রাখায় তা প্রত্যক্ষ করে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) পাগল নয় তাকে ছেড়ে দিতে বলেন, কিছুদিনের ব্যবধানে হালত স্বাভাবিক হওয়ার পর তিনি আকিয়াবে তাঁদের জমিদারী এস্টেটে গমন করেন। তথা হতে তিনি মায়ানমারের বাম্মু শহরে মসজিদে সাময়িক ইমামতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। ঐ সময় রমজান মাসের ২৭ তারিখের শবে ক্বদরের রাত্রে তিনি পুনরায় মজজুব হালতে চলে যান। দেশে এ সংবাদ আসার পর তাঁর সহোদর ছোট ভাই মাওলানা ছালেহ আহমদ দ্রুত বাম্মু গমন করেন এবং তথা হতে অতি কষ্টে স্টীমারে করে চট্টগ্রাম হয়ে চুনতী নিয়ে আসেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-কে। অতঃপর তাঁর নানা ধরনের চিকিৎসা শুরু হয় যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং হযরত আজমগড়ী (রহ.)-এর কথার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। তিনি প্রায় দীর্ঘ ২০/২৫ বছর বনে-জঙ্গলে কাটান। মাঝে-মধ্যে লোকালয়ে আসতেন। তাঁকে দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকার লোকালয়ে বা লোকালয়ের নিকটে হঠাৎ করে দেখা যেত। তিনি মুখে নবী পাকর (স.) শানে সব সময় একটি বিখ্যাত শ্লোক আওড়াতেন। তা হল এই–

"হাম মাজারে মোহাম্মদ (স.) পে মর জায়েঙ্গে
জীন্দেগী মে য়্যাহী কাম কর জায়েঙ্গে।"

প্রায় ২০/২৫ বছর মজজুব অবস্থায় তাঁর বহু কারামত প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে প্রথম প্রথম তাঁকে পাগল হিসাবে ভুল বুঝলেও পরবর্তীতে তিনি যে একজন মহান

আশেকে রসুল, ফানাফির রসুল তা পর্যায়ক্রমে সাধারণ জনগণ উপলব্ধি করতে শুরু করে। হযরত আরাকানী (রহ.) হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.)-এর এন্তেকাল হতে ঘনঘন চুনতী সফর করতেন তরীকতে তবলীগের উদ্দেশ্যে। তিনি হযরত আজমগড়ী (রহ.)-এর অন্যতম বিখ্যাত খলিফা। তিনি একাধিকবার বলেছিলেন, হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর মজজুব হালত স্থায়ী হবে না। তিনি স্বাভাবিক হালত ফিরে পাবেন এবং তাঁর বুজুর্গী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে, বাস্তবে হয়েছেও তাই। অর্থাৎ ৫০-এর দশকের শেষের দিকে তিনি পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। ১৯৫৯ সালে বর্তমান বাড়ীতে তাঁর বাড়ীভিটা স্থানান্তর করা হয় পুরাতন পৈত্রিক বাড়ীভিটা থেকে। ১৯৭০ সালে চুনতী মাদ্‌রাসাকে ফাজিল স্তর থেকে কামিল স্তর করার পদক্ষেপ নেন তিনি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অস্থিরতার কারণে তা থেমে যায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী তাঁর বাড়ীতে উভয়পন্থী মানুষ আশ্রয় লাভ করেন। তিনি জীবনে ৬ বার হজ্বব্রত পালন করেন। ১ম বার ১৯৭০ সালে, ২য় বার ১৯৭২ সালে, ৩য় বার ১৯৭৪ সালে, ৪র্থ বার ১৯৭৬ সালে ভারত হয়ে দিল্লী থেকে হজ্ব ভিসা নিয়ে, ৫ম বার ১৯৭৮ সালে এবং ৬ষ্ঠ ও শেষবার ১৯৭৯ সালে তৎকালীন সরকারের রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসাবে। তিনি ১৯৮০ সালে পৃথকভাবে ভারত সফর করেন। ১৯৭২ সালে ১ দিনব্যাপী ১ম মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) শুরু করেন। পরবর্তী বৎসর থেকে পর্যায়ক্রমে দিন বাড়তে বাড়তে ১৯ দিনব্যাপী স্থায়ী হয় যা আজ পর্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে চালু আছে।

১৯৭৬ সালে ২য়বার উদ্যোগ নিয়ে চুনতী হাকিমিয়া মাদ্‌রাসাকে ফাজিল স্তর থেকে কামিল স্তরে উন্নীত করিয়ে নেন। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত মাহফিলে সীরতুন্নবী তাঁর বাড়ীর (শাহ মঞ্জিলের) দক্ষিণ পার্শ্বে উদযাপিত হলেও পরবর্তীতে পাহাড়-জমি খরিদ করে সমতল করে ৩২ কানীর (১২.৮০ একর) বিশাল এরিয়া নিয়ে মাহফিলে সীরতুন্নবীর (স.) স্থায়ী ময়দান হিসাবে অত্র সীরত ময়দান প্রতিষ্ঠালাভ করে। সারাদেশে ধর্মীয় মাহফিলের উদ্দেশ্যে টঙ্গী বিশ্ব এজতেমা ময়দান বাদে সমতল এরিয়ায় এতবড় ময়দান কম পাওয়া যাবে। তিনিই প্রথম ঘরোয়া পরিবেশ থেকে সামগ্রিক পরিবেশে মাহফিলে সীরতুন্নবীর (স.) প্রবর্তন করেন। শুধু তাই নয়, চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে ধর্মীয় মাহফিলে ওয়ায়েজ এবং মেহমান চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন এ মাহফিলে সীরতুন্নবীর (স.) মাধ্যমেই শুরু হয় বলা যেতে পারে। অর্থাৎ চট্টগ্রামের সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সাথে ধর্মীয় যোগাযোগ হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-ই সূত্রপাত করেন বলা যাবে। দীর্ঘ ৩৪ বছরের ব্যবধানে এ মাহফিলে সীরতুন্নবীতে (স.) রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারপতি থেকে শুরু করে বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গ তশরীফ আনেন। সাথে সাথে ধর্মীয় বিভিন্ন আকিদার বিভিন্ন বিখ্যাত বিখ্যাত আলেম, ওলামা, পীর-মশায়েখগণ তশরীফ আনেন। তাঁর ইন্তেকাল পরবর্তী ১৯ দিনব্যাপী এ মাহফিলে

সীরতুন্নবী সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে জারী থাকা তাঁর অন্যতম কারামত বলা যেতে পারে। তাঁর জীবনে একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল বিখ্যাত একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা, বিশাল সীরত ময়দানের পশ্চিম পার্শ্বে তাঁর জীবদ্দশায় মসজিদে বায়তুল্লাহ নামকরণে এ মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে যান। তাঁর ইন্তেকাল পরবর্তী মসজিদে বায়তুল্লাহ পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

তাঁর ইন্তেকালের দীর্ঘ ২৪ বছর পর তথ্যসমৃদ্ধ তাঁর একটি মোবারক জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.)-এর পাশাপাশি পবিত্র মেরাজুন্নবী (স.) মাহফিল, লায়লাতুল বরাত, লায়লাতুল ক্বদর ইত্যাদি ধর্মীয় মাহফিল/উৎসবসমূহ তাঁর জীবদ্দশায় চালু করেন। এ মহান আশেকে রসুল (স.)-এর রফে দরজাত কামনা করছি। আমিন।

কুতুবদিয়ার কুতুব হযরত মালেক শাহ্

ফানাফিল্লাহ জগতে বিচরণকারী আল্লাহর ওলি হযরত মালেক শাহ্ (রহ.) চট্টগ্রাম মহানগরীর হালিশহরের বিখ্যাত ওলি হযরত হাফেজ মুনির উদ্দিন (রহ.)-এর অন্যতম আদরের মুরিদ ছিলেন। হযরত মালেক শাহ্ (রহ.) যেমনি শরীয়তের বড় আলেম ছিলেন তেমনি তরীকতের জগতে দ্রুত উপরের দিকে ধাবিত হতে থাকেন। অতি বিজ্ঞ তথা কামেল ওলির হাতে বায়েত হওয়ায় হযরত মালেক শাহ্ (রহ.) কামালিয়াত হাসেল করে ফানাফিল্লাহ জগতে পৌঁছে যান।

বৃহত্তর চকরিয়ার বর্তমান পেকুয়া উপজেলার উজানটিয়া ও রাজখালীতে আমাদের পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি পরিচালনায় সমুদ্রপথে যাওয়া-আসাকালীন কুতুবদিয়ার হযরত মালেক শাহ্ (রহ.)-এর দরবারে যাওয়ার সুযোগ হত। তেমনিভাবে হযরত আজমগড়ী (রহ.)-এর অন্যতম নূরেনজরে চুনতীর হযরত শাহ্ সাহেব (রহ.) ও তরীকতের উচ্চ স্থানে পৌঁছে ফানাফিল্লাহ জগতে পৌঁছে যান। আজমগড়ী সিলসিলার অন্যতম ওলি হিসাবে বারেবারে চুনতী গমন করি যেয়ারতের উদ্দেশ্যে।

হযরত মালেক শাহ্ (রহ.) দেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থানের পর ১৯৬০ সাল থেকে কুতুবদিয়াতে অবস্থান করতে থাকেন। তথায় সবসময় কম-বেশী মানব সমাগম থাকত তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায়।

তাঁর জীবনে বহু কারামত রয়েছে। তবে জীবনের শেষ কারামত হল তাঁর ইন্তেকাল ও নামাজে জানাজা। তিনি তেমন সফর করতেন না। কুতুবদিয়াতে অবস্থান করতেন। সফর করলেও কদাচিৎ। কিন্তু চিকিৎসার তাগিদে তাঁকে চট্টগ্রাম মহানগরে আসতে হয় এবং চট্টগ্রাম শহরে ইন্তেকাল করেন। পরদিন সকাল নয়টায় বিশাল প্যারেড মাঠে তাঁর নামাজে জানাজা হওয়ার প্রোগ্রাম জানতে পারি। হযরত মালেক শাহ্ (রহ.) ফানাফিল্লাহ জগতে বিচরণ করায় তাঁর ভক্ত ছাড়া মুরিদ থাকার কথা নয়। তিনি ১৯৬০ সাল থেকে কুতুবদিয়ায় অবস্থান করে আসছেন। তারপরেও প্যারেড মাঠে লক্ষাধিক লোকের সমাগমে নামাজে জানাজা তাঁর জীবনের অন্যতম করামত বলে মনে করি।

মহান আল্লাহ্ পাক আমাকে আমার পীর গারাংগিয়ার হযরত বড় হুজুর (রহ.)-এর ৪৩২ পৃষ্ঠাপ্যাপী তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী গ্রন্থ লিখার সৌভাগ্য দান করেন। প্রায় বৎসরকাল ধরে তথ্য তালাশে আজমগড়ী সিলসিলার বহু দুর্লভ বিষয় জানার সৌভাগ্য হয়। তেমনিভাবে হযরত মালেক শাহ্ (রহ.)-এর একাধিক করামত জানার সুযোগ হয়। তৎমধ্যে নিম্ন করামত পাঠক মহলে উপস্থাপন করলাম।

হযরত আজমগড়ী (রহ.) উপমহাদেশ বিভাগের আগে ভারতের উত্তর প্রদেশের আজমগড় জিলা হতে তথা তার নিজ বাড়ী হতে বৎসরে একবার চট্টগ্রাম সফর করতেন তরীকতে তবলিগের উদ্দেশ্যে। তেমনি একবার তিনি তরীকতের তবলিগে সফর করে রেলযোগে চট্টগ্রাম ত্যাগ করছিলেন। তখন হযরত মালেক শাহ্ (রহ.)-এর যৌবনকাল বলে জানতে পারি।

রেল স্টেশনে হালিশহরের হাফেজ মুনির উদ্দিন (রহ.) গারাংগিয়ার বড় হুজুর (রহ.) সহ হযরত আজমগড়ী (রহ.)-এর স্বনামধন্য খলিফাগণ থাকা স্বাভাবিক তাদের হযরত পীর সাহেবকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে। তেমনিভাবে আজমগড়ী সিলসিলার বহু মুরীদ ও অনুরাগী ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত থাকার কথা।

হযরত আজমগড়ী (রহ.) যথারীতি সকলের থেকে বিদায় নিয়ে ট্রেন ছাড়ার আগ মুহূর্তে ট্রেনে আরোহণ করে তাঁর কক্ষে বসে পড়েন। অপরদিকে হযরত মালেক শাহ্ (রহ.) চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দ্রুতগতিতে পূর্ব-পশ্চিমে হাঁটাহাঁটি করতে থাকেন। আর বলতে থাকেন তাঁর মাতৃভাষায়, "তুই কেনে যাবি যা চাই, আঁরে কি দি যাবি দি যা।" অর্থাৎ আপনি কেমনে যাবেন যান দেখি, আমাকে কি দিবেন দিয়ে যান।

রেলের গার্ড সবুজ পতাকা দেখায়ে ট্রেন ছাড়ার দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু চালক চেষ্টা করেও ট্রেন চলে না। অপরদিকে, হযরত মালেক শাহ্ (রহ.) রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঐ একই কথা বারেবারে পুনরাবৃত্তি করে দ্রুত পায়চারি করতে থাকেন।

ট্রেন না চলার কারণ মহান আল্লাহ পাকের জিন্দা অলি হযরত আজমগড়ী (রহ.)-এর না জানার কথা নয়। তিনি ট্রেনে তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে ট্রেনের দরজায় দাঁড়ান এবং উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন, "মালেক কো পাকড়াও।" অর্থাৎ মালেককে ধরে নিয়ে আস। এখানে উল্লেখ্য, হযরত আজমগড়ী (রহ.) তাঁর স্বনামধন্য খলিফাগণকে এক শব্দের নামে ডাকতেন। যেমন সালাম–হযরত আবদুস সালাম আরাকানী (রহ.), মুনির-হালিশহরের হযরত হাফেজ মুনির (রহ.), নজির-চুনতীর হযরত নজির আহমদ (রহ.), মজিদ–গারাংগিয়ার হযরত বড় হুজুর (রহ.) রসিদ গারাংগিয়া হযরত ছোট হুজুর (রহ.) ইত্যাদি।

তেমনিভাবে মালেক কো পাকড়াও বলার সাথে সাথে ৪/৫ জন যুবকশ্রেণীর লোক দ্রুত গিয়ে প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করা অবস্থায় হযরত মালেক শাহ (রহ.)-কে ধরে ফেলে এবং টেনে টেনে হযরত আজমগড়ী (রহ.)-এর ট্রেনের কক্ষের দরজায় নিয়ে আসে। হযরত আজমগড়ী (রহ.) হযরত মালেক শাহ (রহ.)-এর ঘাড়ে একটি থাপ্পড় মারেন। সাথে সাথে হযরত মালেক শাহ্ হুঁশহারা হয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে যান। তখন হযরত আজমগড়ী (রহ.) বললেন, "ড্রাইভারকো বোলো ট্রেন ছাড়নে কে লিয়ে।" অর্থাৎ ড্রাইভারকে বলো ট্রেন ছাড়ার জন্য। সাথে সাথে ড্রাইভার ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যায়।

ছনুয়া মনুমিয়াজি জমিদার বাড়ীর মরহুম মোহাম্মদ উল্লাহ মিয়া চৌধুরী হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর অন্যতম মুরিদ ছিলেন। তিনি ৮৫ বছর বয়সে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৭ ইং ইন্তেকাল করেন। তাঁর পিতা মাওলানা গোলাম কাদের মিয়া চৌধুরী ১৯২৩ ইংরেজীতে ৫৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত আজমগড়ী (রহ.)-এর মুরিদ ছিলেন কিনা নিশ্চিত নই। হযরত আজমগড়ী (রহ.) চট্টগ্রাম অঞ্চলে সফরকালে ছনুয়া মনুমিয়াজী বাড়ীতে তশরীফ নিতেন। তথায় মাগরিবের নামাজান্তে হযরত আজমগড়ী (রহ.)-এর পিছনে অনেকে মোরাকাবায় (ধ্যান) নিমগ্ন থাকাটা স্বাভাবিক।

উক্ত সময় হযরত মালেক শাহ (রহ.) ও অন্যদের সাথে মোরাকাবায় বসে যান। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তাঁর শরীরে আগুন ধরে যায়। সাথে সাথে তিনি দৌড়ে গিয়ে নিকটস্থ পুকুরে ঝাপিয়ে পড়েন।

মূলতঃ হযরত মালেক শাহ (রহ.) ফানাফিল্লাহ জগতে বিচরণ করায় তাঁরই আপাদমস্তক অন্য সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্নতর হওয়া স্বাভাবিক।

১৯৫৫ সালে হযরত আজমগড়ী (রহ.) বার্ধক্যের চাপ উপেক্ষা করে সপ্তাখানেকের প্রোগ্রাম নিয়ে শেষবারের মত দীর্ঘ ১৭ বছরের ব্যবধানে চট্টগ্রাম সফর করেন আজমগড়ী সিলসিলার গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনার প্রয়োজনের তাগিদে। ঐ সময় কয়েকদিন তিনি হালিশহরে হযরত হাফেজ সাহেব (রহ.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। সে সময় হযরত মালেক শাহ (রহ.) তাঁর কয়েকজন ভক্তসহ হালিশহরে হাফেজ সাহেব হুজুরের বাড়ির নিকটতম স্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন।

হযরত মালেক শাহ্ (রহ.) বড় দরজার আলেমেদ্বীন ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দারুল উলুম মাদরাসা হতে ফাজিল পাস করেন। পরবর্তীতে দারুল উলুম দেওবন্দে আরো লেখাপড়া করেছিলেন।

হযরত মালেক শাহ্ (রহ.) প্রখ্যাত ওলী হযরত হাফেজ মুনির উদ্দিন (রহ.)-এর হাতে তরীকতে দাখিল হয়ে দ্রুত আধ্যাত্মিক সাগরে প্রবেশ করে ফানাফিল্লাহ জগতে পৌঁছে যান, যা কি না হযরত হাফেজ সাহেব (রহ.)-এর মাধ্যমে হযরত আজমগড়ী (রহ.)-এর নূরেনজর বলতে পারি।

তিনি ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০০ চট্টগ্রাম মহানগরীতে ইন্তেকাল করেন। বছরের যে কোন সময় তাঁর কবর শরীফে যেয়ারতকালীন দোয়া দরূদ পড়ে সওয়াব বকশিস করা যাবে। তাঁর উছিলা দিয়ে মহান আল্লাহপাকের দরবারে চাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি ফানাফিল্লাহ জগতে থেকে ইন্তেকাল করায় তাঁর কবরে মোরাকাবা করা যাবে না।

মহান আল্লাহপাক হযরত মালেক শাহ্ (রহ.)-কে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমীন।

বর্তমানকালে হজ্বের পরিবেশ

আমাদের দেশে হজ্বযাত্রী গমনের শত বছরের ইতিহাস রয়েছে। সুলতানী ও মোঘল আমলে মুম্বাই থেকে সাগরপথে হজ্বযাত্রীরা কিভাবে যেত তা স্পষ্ট নয়। তবে অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্থলপথে এদেশ থেকে হজ্ব করতে তথায় গমন করেছেন তার ইতিহাস রয়েছে। বৃটিশ আমলে মুম্বাই বন্দর থেকে প্রতিবছর সাগরপথে হজ্বযাত্রী প্রেরণ প্রচলন শুরু হয়। পাকিস্তান আমলে চট্টগ্রাম থেকে সাগরপথে এবং ঢাকা থেকে করাচি হয়ে আকাশপথে হজ্বে গমন প্রচলন ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত হজ্বে গমন প্রথা সরকারী নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৭৭ সাল থেকে সরকারী ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারীভাবে হজ্বযাত্রী গমন শুরু হয়ে যায়। এতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন ট্রাভেল এজেন্সীগণ। কাজেই দেশের ইতিহাসে এই প্রথম ১৯৭৭ সাল থেকে হজ্বযাত্রী নিয়ে সেবার পাশাপাশি ব্যবসাও শুরু হয়ে যায়। আগে হজ্ব নিয়ে আর্থিক লাভবান হতেন শুধুমাত্র ২ পবিত্র নগরীর বাসিন্দা তথা মক্কা মুকাররমাবাসী ও মদিনা মুনাওয়ারাবাসী। কিন্তু বর্তমানকালে শুধু আমাদের দেশ নয় সারাবিশ্বে হজ্ব নিয়ে সেবার মাধ্যমে ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা গত কয়েক যুগ থেকে ধারণাতীত উন্নতি সাধন করে। সাথে সাথে সৌদি টিভির সহযোগিতায় হজ্ব ও হারম শরীফের নামাজের চিত্র সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এতে মুসলমানগণের মধ্যে হজ্বের আকর্ষণও বেড়ে যায়। গত কয়েক যুগের ব্যবধানে হজ্বযাত্রীর সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমনটা আমাদের মত গরীব দেশেও। যদিওবা আমাদের কোটা লাখের উপরে।

১৯৭৭ সাল থেকে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্ব করার প্রবণতা শুরু হয়ে তা দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। ফলে আশির দশক থেকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ কাফেলা প্রথা সৃষ্টি করে হজ্বযাত্রী প্রেরণে এগিয়ে আসে। নব্বই-এর দশকে আমাদের দেশে কাফেলা প্রথা ধারণাতীত প্রসার লাভ করে।

আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট করে ট্রাভেল এজেন্সীর সহায়তায় টিকিট ও সৌদি হজ্ব ভিসা নিয়ে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় কাফেলার নিয়ন্ত্রণে ব্যাপকভাবে হজ্ব করার প্রবণতা চালু হয়ে যায়। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সরকার এ বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় মৌন সম্মত ছিল। কিন্তু ২০০০ সাল থেকে সরকার এ ব্যবস্থাপনার উপর নজরদারী, খবরদারী শুরু করতে বাধ্য হয়। যেহেতু এ বেসরকারী ব্যবস্থাপনা সরকারী ব্যবস্থাপনাকে বহুগুণে ডিঙ্গিয়ে যায় এবং সাথে সাথে নানান ঘাপলা-দুর্নাম সংবাদপত্রে আসতে থাকে।

২০০০ সাল থেকে সরকার এজেন্সী প্রথা প্রবর্তন করে এবং সরকারী ব্যবস্থাপনা নিয়মে এ বেসরকারী এজেন্সী প্রথায়ও ওয়ানটাইম পাসপোর্ট তথা একবার হজ্ব করার জন্য পিলগ্রিম পাস প্রচলন করে। এজেন্সী প্রথা চালু হওয়ার সাথে সাথে ১৯৭৭ সাল থেকে যে সমস্ত ট্রাভেল এজেন্সী হজ্বযাত্রী প্রেরণ করে আসছিল তাদের মধ্যে অনেকে সরকারীভাবে হজ্ব এজেন্সী নিয়ে নেয়। অপরদিকে, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কাফেলা প্রধানগণের মধ্যে যারা বেশী সফলতা লাভ করেছেন তাঁরাও হজ্ব এজেন্সী নিয়ে নেন। এক এক এজেন্সীগুলোর ভিতর একাধিক হজ্ব কাফেলাও রয়েছে। এজেন্সীর ভিতর কাফেলা নেই এ রকম সংখ্যা কম, কাফেলাগণকে হজ্বযাত্রী প্রেরণ করতে কোন না কোন এজেন্সীর নিয়ন্ত্রণে যেতে বাধ্য। অপরদিকে, এমন বহু এজেন্সী আছে যারা হজ্বযাত্রী পাওয়ার জন্য কাফেলার উপর নির্ভরশীল।

আমাদের দেশে যে সমস্ত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ যারা ৫০/৬০ জন বা তৎউর্ধ্বে হজ্বযাত্রী পান তাঁরা একটি ধর্মীয় নাম দিয়ে কাফেলা করতে সচেষ্ট থাকে। আর যারা ৫/৭ জন বা ১৫/১০ জন হজ্বযাত্রী পান তারা কোন না কোন কাফেলা/এজেন্সীর নিয়ন্ত্রণে চলে যান। এ রকম ধর্মীয় নেতৃত্বে ৫/৭ জন বা ১৫/২০ জনের অসংখ্য হজ্ব গ্রুপ রয়েছে। সারাদেশে মনে হয় ছোট ছোট হজ্ব গ্রুপের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে এজেন্সী/কাফেলা প্রধানগণকে কেহ কেহ আমিরুল হজ্ব আবার কেউ কেউ মুয়াল্লিম লক্বে ভূষিত করছে। অপরদিকে, ছোট ছোট হজ্ব গ্রুপ প্রধানগণকে মোয়াল্লেম বা নায়েবে মোয়াল্লেম বলা হচ্ছে। মোয়াল্লেম অর্থ শিক্ষক বা শিক্ষাদাতা, আমাদের দেশে মাত্র ১০/২০ বছরের ব্যবধানে অসংখ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ হজ্বযাত্রী প্রেরণ সেবায় এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে মসজিদের খতীব, ইমাম, মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ, মোহতামিম, উপাধ্যক্ষ বা নায়েবে মোহতামিম, মুহাদ্দিস, সিনিয়র শিক্ষক, পীর, মুফতীগণ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা তাদের নিয়ন্ত্রণে কিছু সংখ্যক হজ্বযাত্রী নিয়ে কাফেলা এজেন্সীর নিয়ন্ত্রণে হজ্ব করতে যান। হজ্ব কার্যক্রমে তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে হাজীগণের দেখাশুনার পাশাপাশি ধর্মীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করে থাকে। অপরদিকে কাফেলা এজেন্সী প্রধানগণ এ গ্রুপ প্রধানগণকে যেমনি বিনা পয়সায় হজ্ব করাবে তেমনি গ্রুপের সংখ্যানুপাতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাবে এবং তা অতিগোপনে বলে জনশ্রুতি আছে।

বিগত ১০/২০ বছর থেকে হজ্ব কাফেলা এজেন্সীগণ রং-বেরং এর কাগজ ছাপিয়ে তাতে নানান সুযোগ সুবিধা উল্লেখ করে ব্যাপক প্রচার চালাবে হজ্বযাত্রী পাওয়ার উদ্দেশ্যে। অনেক কাফেলা-এজেন্সী টাকা খরচ করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছে–হজ্বযাত্রী পাওয়ার নিমিত্তে।

হজ্বযাত্রীগণ মহান আল্লাহপাকের দাওয়াতী মেহমান। কাজেই এ সমস্ত আল্লাহর মেহমানগণের সেবা করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ তাতে কোন ইতস্তত নেই। কিন্তু এ হজ্বযাত্রী সেবার মাধ্যমে ফ্রি হজ্ব করা, আর্থিক লাভবান হওয়া, অস্বীকার করা যাবে না। এ লাভের মধ্যে বড় অংক আসে উভয় হারমে ঘর ভাড়ার মধ্য থেকে।

ফলে কাফেলা এজেন্সীগণের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নমানের ঘর নেয়া এবং ঘর অনুপাতে বেশি হজ্বযাত্রী রাখা তথা গাদাগাদি বা গিজ গিজ করে রাখার ব্যাপক দুর্নাম রয়েছে, সাথে সাথে খাবারের মান নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। হজ্ব এজেন্সী-কাফেলা সেবার মাধ্যমে একটি বড় ব্যবসা তা অস্বীকার করা যাবে না। যদি একজন হজ্বযাত্রী থেকে ন্যূনতম ১০,০০০/-টাকাও লাভ করা যায় তবে ১০০ জন হজ্ব যাত্রীর ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা, ৫০০ জন হজ্বযাত্রী হলে ৫০ লক্ষ টাকা। তার অতিরিক্ত নিজে ফ্রি হজ্ব করতে পারা, নিকটাত্মীয়স্বজনকে ফ্রি হজ্ব করাবেন, কেনাকাটা করবে ইত্যাদি। কাজেই ছোট ছোট গ্রুপ প্রধানকে ফ্রি হজ্ব করায়ে আর্থিক সহায়তা দিয়ে যদি বড় আকারের কাফেলা-এজেন্সী করা যায় তবে তা সেবার মাধ্যমে একটি ভাল ব্যবসা বলা যাবে। চট্টগ্রামের মেয়র সাহেব রসিকতা করে হজ্ব ব্যবসা করছেন বললেও আমার মনে হয় না বাংলাদেশে কোন এজেন্সী-কাফেলা সেবা বাদে ব্যবসা করতেছে তা স্বীকার করবে। বরং বলবে এখানে কোন লাভলভ্য নেই বরং জমা-খরচ সামঞ্জস্য রাখা কঠিন। কিন্তু সারাদেশে শত শত এজেন্সী-কাফেলার মধ্যে ২/৪ জনও পাওয়া যাবে মনে হয় না যারা হজ্বের পর প্রকাশ্যে জমা-খরচ হিসাব দেবে।

দেশে হজ্ব মওসুম শুরু হলে হজ্বযাত্রী পাওয়ার জন্য অনেকটা অঘোষিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কাফেলা/এজেন্সীগুলোর মধ্যে। সে লক্ষে বর্ণিল প্রচারপত্র ব্যাপকভাবে বিলিবন্টন হতে থাকে। কথায় ও প্রচারে যে সকল সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয় তথায় গিয়ে তার পরিপূর্ণতা অধিকাংশ কাফেলা/এজেন্সী রক্ষা করে না।

অপরদিকে, দুই লক্ষ এর উপরে টাকা খরচ করে হজ্ব করে এসে ২য় বার শতকরা কজনইবা আবার হজ্বে যেতে পারে। কাজেই দেশে কথার সাথে তথায় কাজের মিল না থাকলে তেমন বিরূপ প্রভাব কম পড়ে কাফেলা-এজেন্সীগুলোর মধ্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশে কথার সাথে তথায় কাজের মিল না থাকা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। স্বাভাবিক হলেও তথায় কাফেলা/এজেন্সীগণের সাথে হজ্বযাত্রীগণের কথা কাটাকাটি তিক্ততাও স্বাভাবিক থাকে। অনেক নম্র ভদ্র হজ্বযাত্রী মনের গভীরে দুঃখ-বেদনা নিয়ে নিরব থাকে। দেশে কথা–প্রতিশ্রুতির সাথে তথায় কাজের মিল না হলে এ হজ্বযাত্রীর টাকার আয় হালাল হচ্ছে কি না ভাবতে হবে। আমি মনে করি তথায় যতটুকু সেবা দেওয়া সম্ভব দেশে যাতে তার চেয়ে কম বাদে বেশী বলা না হয়। তা মুখে হোক প্রচারপত্রে হোক। ২ লক্ষ টাকার উপরে প্রদান করার পর একজন হজ্বযাত্রীকে তথায় কথা রক্ষা না করা কোনমতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কাফেলা/এজেন্সীগণের মধ্যে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ নেতৃত্ব দিচ্ছেন তা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতি বছর অসংখ্য মহিলা এ কাফেলা/এজেন্সীর নিয়ন্ত্রণে মোহরেম না নিয়ে হজ্ব করতে যাচ্ছে অন্যান্য মহিলাগণের সাথে। সৌদি

আইন হল কোন মহিলা হজ্ব বা ওমরাহ করতে হজ্ব বা ওমরাহ ভিসা নিতে মহিলার সাথে তার একজন মোহরম থাকতে বাধ্য এবং তা ধর্মসম্মতও। বর্তমানকালে কাফেলা এজেন্সীগণ হজ্বযাত্রী হিসাবে ঐ মহিলাকে পাওয়ার জন্য পরপুরুষকে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মোহরম সাজাচ্ছে। ঐ মিথ্যায় মহিলার হজ্ব ভিসা নিয়ে কাফেলা/এজেন্সীর অন্যান্য মহিলাগণের সাথে হজ্বে নিয়ে যাচ্ছে।

দেশে কাফেলা/এজেন্সী গঠন একটি সুন্দর ভাল উদ্যোগ। আশা করব এ উদ্যোগকে সম্পূর্ণ সেবাধর্মী ও প্রশ্নাতীত রাখতে সচেষ্ট থাকা। একজন অনভিজ্ঞ লোক এজেন্সীর নিয়ন্ত্রণে হজ্ব করে আসতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। যেহেতু তারা হজ্ব ভিসা, বিমানে যাওয়া-আসা সিট বুকিং, পবিত্র নগরীতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা, ৫ দিনব্যাপী হজ্ব কার্যক্রমে সহযোগিতা করা এক কথায় হজ্বে যাবতীয় কিছুতে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। কাজেই হজ্বযাত্রীগণ যাতে হজ্ব করতে গিয়ে কথা আর কাজে অমিল না তাকে মত সচেষ্ট থাকা চাই। সাথে সাথে মুখে যে রকম সেবার কথা বলা হচ্ছে বাস্তবেও সেবা ঠিক রাখা চাই।

এ কালে বিভিন্ন মাধ্যমে হজ্ব করা

এ কালে বিভিন্ন মাধ্যমে হজ্ব করার সুযোগ এসে গেছে। বৃটিশ আমলতো নয়ই, পাকিস্তান আমলেও সারাদেশ থেকে মাত্র ৫/৬ হাজার ভাগ্যবান ব্যক্তি হজ্ব করতেন। স্বল্প সংখ্যক তথা মুষ্টিমেয় কতেক ব্যক্তি ঢাকা থেকে করাচি হয়ে বিমানে হজ্ব করতে যেতেন। বাদ বাকী সকলে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে জেদ্দা গমন করতেন সাগরপথে।

অতএব, পাকিস্তান আমলে হজ্বযাত্রীগণের মধ্যে ২/১ জন মাত্র একাধিকবার হজ্ব করে থাকতেন। অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে যারা হজ্ব করতে যেতেন তারা নিজের জন্যই যেতেন। শতকরা ২/১ জন হয়তো বদলা হজ্বের জন্য যেতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সাল থেকে মাত্র ৩ হাজার হজ্বযাত্রীকে লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত করে বিমানে হজ্বে পাঠাত।

১৯৭৬/৭৭ সালে সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ঢাকায় দূতাবাস খুললে সর্বপ্রথম ২ ক্যাটাগরীর মানুষ তথায় যাওয়া শুরু করে। ১. ওমরাহ ভিসা বা হজ্বভিসার নামে তথায় গিয়ে টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে থেকে যাওয়া। ২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কল্যাণে চাঁদা কালেকশনের উদ্দেশ্যে যাওয়া। এর কিছুদিনের ব্যবধানে বৈধভাবে ভিসা নিয়ে একামাওয়ালার সৌদি আরব যাওয়া শুরু হয়ে যায়।

দীর্ঘদিন এভাবে চলার পর ৯০-এর দশকে হজ্বযাত্রীর কল্যাণে হজ্ব কাফেলা প্রথা শুরু হয়। ২০০০ সালের দিকে এ কাফেলা প্রথা সরকার নিয়ন্ত্রণ করে সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হজ্ব এজেন্ট হিসাবে বাস্তব রূপ লাভ করে।

এ কাফেলা/এজেন্টের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে হজ্ব সম্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে। অনেক রাজনৈতিক ও উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা, প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ সরকারের বা সৌদি সরকারের অতিথি হয়ে হজ্ব করতে যায়।

অর্থাৎ এ কালে বহুবিধ উপায়ে হজ্ব করার সুযোগ হয়ে গেছে :

১। নিজের তথা পারিবারিক হালাল টাকা ব্যয় করে দেশ থেকে গিয়ে হজ্ব করে আসা, যারা এভাবে শুধু হজ্বের নিয়তে নিজের টাকা ব্যয় করে দেশ থেকে গিয়ে পুনরায় দেশে ফিরে আসে, তাদেরকে অতীব ভাগ্যবান বলা যায়। যদি তাদের এ টাকা হালাল হয়।

২। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বৈধভাবে সরকারী আইন মেনে হজ্ব করা। একালে এ সংখ্যা কম নয়। বাংলাদেশের হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সৌদি আরবের সরকারী নিয়মকানুন মেনে হজ্ব করে পুনরায় ফিরে যাচ্ছে।

৩। বদলী হজ্ব : দেশ থেকে শুধুমাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্যে অপরের টাকায় অপরের জন্য বদলী হজ্ব করে দেশে ফিরে আসা, পাকিস্তান আমলে এর সংখ্যা অতি নগণ্য হলেও এ কালে এ সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। সৌদি আরবে বৈধভাবে টাকা রোজগারের জন্য অবস্থান করে তথা একামাওয়ালা হিসাবে থেকে হজ্ব করা। বাংলাদেশের কয়েক লক্ষ লোক বর্তমানে সৌদি আরবে অবস্থান করছে। এদের মধ্যে, একামাওয়ালার সংখ্যা কম নয়। এ একামাওয়ালাদের মধ্যে বাংলাদেশী হাজার হাজার নাগরিক হজ্ব করছে।

৫। সৌদি আরবে অবৈধ অবস্থানকারীর হজ্ব করা ঃ দেশে আর্থিক প্রতিকূলতার কারণে ওমরাহ ভিসা বা হজ্ব ভিসার নাম করে টাকা কামানোর উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাচ্ছে। তারা ভিসার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরপর অবৈধ অবস্থানকারী হয়ে যায়। সাথে সাথে সৌদি আরবে একামা নিয়ে গিয়ে কফিলের সাথে বনিবনা না হলে অন্যত্র চাকুরি/ব্যবসায় জড়িত হয়ে অবৈধ অবস্থানকারী হয়ে যায়।

বর্তমানকালে সৌদি আরবের অভ্যন্তরে হজ্ব করা নিয়ে কড়াকড়ি চলছে। তারপরও সরকারী কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে অবৈধ অবস্থানকারীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি হজ্ব করছে।

৬। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা/চাঁদা কালেকশনের জন্য গিয়ে হজ্ব করা : দেশ থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির জন্য চাঁদা কালেকশন করতে গিয়ে তথায় অবস্থান করে হজ্ব করছে। এদের মধ্যে অনেকে তথায় একামা নিয়ে অবস্থান করছে নিয়মিত টাকা কালেকশনের জন্য। তারাও হজ্ব করছে।

গত শতকের ৮০ ও ৯০-এর দশকে এ সংখ্যা অত্যধিক থাকলেও সাম্প্রতিককালে সৌদি সরকারের অতিরিক্ত কড়াকড়ির কারণে এ সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। যেমনটা অবৈধ অবস্থানকারীগণের মত।

৭। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় মুরুব্বী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা বাংলাদেশ সরকারের হজ্ব ডেলিগেট অথবা সৌদি সরকারের অতিথি হয়ে হজ্ব করছেন।

৮। দেশ থেকে অথবা সৌদি আরবে বাংলাদেশী দূতাবাস থেকে হজ্বযাত্রীগণের সেবক হয়ে হজ্ব করা।

৯। কাফেলা/এজেন্সি প্রধান হয়ে হজ্ব করা : কাফেলা/এজেন্সি প্রধান হজ্বযাত্রীর কল্যাণে হোক বা ব্যবসার নিয়তে হোক তাদের নিয়ন্ত্রণে হজ্বযাত্রীগণকে নিয়ে হজ্ব করতে যাবেই। কাজেই সে উপলক্ষে হজ্ব করা হয়ে থাকে।

১০। কাফেলা/এজেন্সির নিয়ন্ত্রণে হজ্বযাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে খাদেম, বাবুর্চি, আলেম তথা মুয়াল্লিম নিয়ে থাকে। কাফেলা/এজেন্সি প্রধান থেকে টাকা প্রাপ্তির পাশাপাশি তারা হজ্বও করে থাকে।

১১। কাফেলা উপপ্রধান হিসাবে হজ্ব করা : বড় বড় কাফেলা/এজেন্সির মধ্যে উপ-কাফেলা প্রধান থাকে। এদের মধ্যে মসজিদের ইমাম বা খতীব, পীর সাহেব, মাদরাসা প্রধান বা সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ রয়েছে। উপ-কাফেলা প্রধান হিসাবে তাদের

নিয়ন্ত্রণে ১০-৩০ জন পর্যন্ত হজ্বযাত্রী হজ্ব করে থাকে। মূল কাফেলা/এজেন্সি প্রধান থেকে টাকা প্রাপ্তির পাশাপাশি মুয়াল্লেম বা নায়েবে মুয়াল্লেম লক্বব ধারণ করে হজ্ব করে থাকে।

১২। ভিক্ষা করার লক্ষে হজ্ব করা : গত শতকের ৮০/৯০-এর দশকে বেশ কিছু সংখ্যক পঙ্গু লোক ভিক্ষা করার উদ্দেশ্যে হজ্ব করতে যেত বলে জানা যায়। সাম্প্রতিককালে সৌদি আরবে ভিক্ষাবৃত্তি অত্যধিক কড়াকড়ির কারণে এ সংখ্যা নিতান্তই কমে গেছে বলা চলে। তবে পাকিস্তান থেকে এখনো ভিক্ষাবৃত্তির নিমিত্তে অত্যধিক লোক হজ্ব করতে যায় বলে জানা যায়। যেহেতু তাদের দেশ থেকে হজ্ব করতে আমাদের দেশের তুলনায় অর্ধেকেরও কম টাকা খরচ হয় বলে জানতে পারি। আমাদের দেশ থেকে ৮০/৯০ এর দশকে কিছু কিছু লোক ভিক্ষা বৃত্তির উদ্দেশ্যে হজ্বে যেতো জানা যায়। বর্তমানে তা লোপ পেতে শুরু করেছে।

১৩। চুরি করার উদ্দেশ্যে হজ্ব করা ঃ শুনতে অত্যধিক খারাপ লাগলেও চুরি করার উদ্দেশ্যে একালে হজ্বে গমন অস্বীকার করা যাবে না। তবে সৌদি আরবে অবৈধ অবস্থানকারীরা হজ্বযাত্রীগণের টাকা-পয়সা চুরির সাথে জড়িত বেশি। ৮০/৯০-এর দশকে আমাদের দেশের কিছু কিছু লোক টাকা-পয়সা চুরির ব্যাপারে জড়িত ছিল বলে শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য তারা অবৈধ অবস্থানকারীও হতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে মিশর ও পাকিস্তানের দুর্নাম বেশী।

উপরোক্ত বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিলে অনায়াসে বুঝা যায় একালে বহুভাবে হজ্ব করার সুযোগ হয়ে গেছে। তবে দেশ থেকে শুধুমাত্র হজ্ব ও মদিনা মুনাওয়ারা যেয়ারতের উদ্দেশ্যে নিজের হালাল টাকা খরচ করে তথায় গমন করে পুনরায় ফিরে আসাগণকে অত্যধিক ভাগ্যবান ব্যক্তি বলা যায়।

একজন ধর্মীয় ব্যক্তির ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি

আমাদের দেশে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বহুল প্রচলিত। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা একে অন্যকে হিংসা-বিদ্বেষ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এ যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। এর গভীরে চিন্তা করলে আমার মনে হয় অপরকে তাচ্ছিল্য করা এবং নিজেকে উর্ধ্বে তুলে ধরা নিজের মতামতকে সঠিক মনে করা অন্যতম কারণ। শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বহুল প্রচলিত। ধর্মের বাড়াবাড়ি বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুন খারাবী রক্তারক্তি চলছে প্রতিনিয়ত। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি থামছেনা বা থামবারও নয়।

একমাত্র ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ও বিদ্বেষের কারণে বিশ্বের ১৩০ কোটি মুসলমান চরম মূল্য দিচ্ছে, মূল্য দিয়ে চলছে। জানিনা এ চরম মূল্য দেওয়া কবে থামবে কবে মুসলমানরা স্বকীয়তা ফিরে পাবে।

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি হিংসা-বিদ্বেষ ধর্ম পালনকারী সাধারণ শিক্ষিতের চেয়ে ধর্মীয় শিক্ষিতের কাছে বহুলাংশে বেশী বলে প্রতীয়মান হবে। তাদের উচিৎ হবে সাম্প্রতিককালে বিশ্বে বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব জ্ঞানের সাগর ডা. জাকির নায়েকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

বিশ্ব বরেণ্য ডা. জাকির নায়েক বারেবারে বলে যাচ্ছেন বিশ্বের ধর্মীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশই ইসলামের অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ লিপ্ত। যার দরুণ মুসলমানদের চরম মুল্য দিতে হচ্ছে এ প্রসঙ্গে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে একটা বিষয়ের উপর কমল ধরতে হল।

গত কিছু দিনের ব্যবধানে ঢাকার গুলশানস্থ এক বাড়িতে গত বছর হজ্ব করে আসা কিছু হজ্বযাত্রী নিয়ে রাতের খাবারের আয়োজন করে। তথায় ঢাকার একজন ধর্মীয় ব্যক্তিকে দাওয়াত করে ধর্মীয় আলোচনা করার জন্য। যার বাড়িতে এই আয়োজন তিনি এ বছর হজ্ব করে এসেছেন। তিনি নিজকে আহলে হাদীসের অনুসারী দাবী করেন। যে ধর্মীয় ব্যক্তিকে দাওয়াত করা হয়েছিল তিনি বাংলাদেশে বহুল পরিচিত ও আলোচিত ব্যক্তি যিনি দেশে টিভি চ্যানেলে ধর্মীয় আলোচক হিসাবেও পরিচিতি লাভ করে।

দেশের অধিকাংশ টিভি চ্যানেলে কমবেশি ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এ সকল অনুষ্ঠানাদিতে দেশের বহুসংখ্যক ধর্মীয় ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে থাকেন। তবে ঢাকা গুলশানের বাড়ীতে আলোচক হিসাবে আগত উক্ত ধর্মীয় ব্যক্তির আলোচনা তথা মতামত প্রকাশে উগ্রতামির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি দেশে একটি ধর্মভিত্তিক

রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে জড়িত বলা যাবে। রাজনৈতিক স্বার্থে জনগণের ভোট পাওয়ার স্বার্থে প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও মূলত উক্ত ধর্মীয় ব্যক্তিও আহলে হাদিসপন্থী মনে করি। মূল প্রসঙ্গে চলে আসি, গতবারও (২০০৭) আমার হজ্ব করার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার একমাত্র মেয়ে সালমা খানম ও জামাতা জিয়াউদ্দিন আদিল সহ আমরা একই সাথে হজ্ব করি।

হজ্ব উপলক্ষে মাসাধিককাল তথায় থাকতে অতি আগ্রহী হলেও সালমা ও আদিল কম সময়ে হজ্ব করে আসতে চায় দেশে সন্তানাদিসহ নানা ব্যস্ততার কারণে। ফলে ঢাকার কয়েকটি এজেন্সীর সাথে যোগাযোগ করে একটি এজেন্সীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হই। উক্ত এজেন্সীতে দুইটি ক্যাটাগরী রয়েছে। তৎমধ্যে ইকোনমি হল জনপ্রতি ২ লক্ষ টাকা এবং ভি.আই.পি জন প্রতি ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা। ভি.আই.পিরা সৌদি আরবে ২২/২৩ দিন থাকবে। মিনা আরাফাতে আলাদা বিশেষ ব্যবস্থাপনা এবং মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারায় তাদের জন্য ৫ তারকা মানের হোটেলের ব্যবস্থা থাকবে। আমি সালমা ও আদিলকে বুঝায়ে সেখানে বেশি দিন থাকতে পারি মত ইকোনোমি ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আগেই চলে যাই। তবে এজেন্সীর প্রতি আলাপে পরিষ্কার থাকে ৬/৭ দিনের হজ্ব পিরিয়ড সালমা ও আদিল তথা ভি.আই.পি ক্যাটাগরীর সাথে থাকব, যেহেতু তারা নতুন হজ্ব করতে যাচ্ছে।

২৯ নভেম্বর বাংলাদেশ বিমানে ভোরে ঢাকা থেকে রওয়ানা দিয়ে জেদ্দা হয়ে মক্কা মুকাররমা পৌঁছি। সপ্তাহ খানেক পর মদিনা মুনাওয়ারা গমন করি। ৮ দিন অবস্থান করে ১৪ ডিসেম্বর বাদ জুমা মদিনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুকাররমা রওয়ানা হই, আসবার সময় হজ্বে কেরানের নিয়ত করি।

গত রমজানে ওমরাহ ও যেয়ারতের উদ্দেশ্যে উভয় হারামে অবস্থান পরবর্তী দেশে ফিরার সময় সালমা ও আদিলের জন্য তথাকার মোবাইল সীম কার্ড নিয়ে আসি। ফলে ১৫ ডিসেম্বর শনিবার সৌদি এয়ার লাইনে তারা ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যার পর জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছলে পরে তাদের সাথে অনায়াসে মোবাইলে যোগাযোগ হয়ে যায়। তারা গভীর রাতে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছে আজিজিয়া গেষ্ট হাউসে অবস্থান নেয়। হজ্বের আগে ১ বা ২ দিন তারা আজিজিয়া থাকবে তা এজেন্সীর সাথে কথা পরিস্কার করা আছে। মক্কা মুকাররমা থেকে টেলিফোনে আমার পরামর্শ মতে তারাও ঢাকা থেকে কেরান হজ্বের নিয়ত করে এসেছিল। ১৬ ডিসেম্বর রবিবার সকাল ৮টার দিকে তারা তাওয়াফ সায়ী করতে হারমে আসলে মোবাইলের বদান্যতায় আমি তাদের সাথে মিলিত হয়ে তাওয়াফ সায়ী শুরু করি। তথায় সাক্ষাৎ হয় একই এজেন্সীর মাধ্যমে সস্ত্রীক হজ্ব করতে যাওয়া আল্ ফালাহ্ ব্যাংকের বাংলাদেশ প্রধান মাজেদুর রহমান এর সাথে। তাওয়াফ সায়ীর পর জোহর নামাজ পড়ে নিকটস্থ নাতি ফেরদৌসের হোটেলে তারই সৌজন্যে আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে নিই।

আগে থেকে প্রস্তুত ছিলাম বিধায় আমার কক্ষ থেকে ব্যাগ নিয়ে এসে আমরা ৫ জন টেক্সিযোগে আজিজিয়া গেষ্ট হাউসে চলে যাই। পরদিন ১৭ ডিসেম্বর সোমবার ৮ জিলহজ্ব সকাল বেলা উক্ত এজেন্সীর সৌদি আরব প্রতিনিধি একটি বাস নিয়ে আসে। সকাল ৮টার দিকে আমি ঐ বাসের সম্মুখ দিকে বসে বুঝতে পারলাম অত্র ভি.আই.পি গ্রুপের মধ্যে ধর্মীয় আলেম নেই। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকটা বাধ্য হয়ে সবাইকে নিয়ে বাসের মাইকের মাধ্যমে আমাকে "লাব্বাইক" পড়তে হল। গেষ্ট হাউস থেকে মাত্র ২/৩ শত মিটার পূর্ব দিকে মিনার বড় শয়তানের অবস্থান। এর প্রায় ১ কিলোমিটার দক্ষিণে আমাদের জন্য নির্ধারিত ১৭ নং মুয়াল্লিমের তাবু। সকাল ৯টার দিকে তাবুকে প্রবেশ করে বুঝতে পারলাম তাবুতে অবস্থানের পাশাপাশি খাওয়া দাওয়ারও বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

৮ জিলহজ্ব যোহরের নামাজ পড়তে গিয়ে আমি বিব্রতকর অবস্থায় পড়ি। যেহেতু আমাকে নামাজের ইমামতি করতে হচ্ছে। মিনা থেকে পরদিন সকালে (৯ জিলহজ্ব মঙ্গলবার ১৮ ডিসেম্বর '০৭) এজেন্সীর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ভাড়া করা বাসযোগে ৪৮ জন হজ্বযাত্রী সকাল ৮টার দিকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই। আরাফাতে আদিলসহ কয়েকজন তাবু থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে মসজিদে নমরাতে চলে যায় তথাকার ঈমামের পিছনে জোহর ও আছরের নামাজ একসাথে পড়ার জন্য। আমাদের মধ্যে জোহরের নামাজের পরপর কয়েকজন আছরের নামাজও পড়ে নেয়। আমরা অবশিষ্ট সকলে আছরের সময় হলে পরে আসরের নামাজ পড়ে নিই।

আরাফাতের মুনাজাতও অনিচ্ছা সত্ত্বে আমাকে করতে হয়েছিল। আরাফাত থেকে মুজদলেফা। মুজদলেফা থেকে মিনায় এসে হজ্বের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়। আমার মনে হয় গ্রুপের সকলে আমার পরিচালনায় ধর্মীয় কার্যাদি উৎফুল্লচিত্তে পালন করে গেছে। এই ৫/৬ দিন আমরা মুসাফির ছিলাম বিধায় সময় ও সুযোগ হলে অনেকে সুন্নত নামাজ পড়েছেন। আমিও ব্যক্তিগত জীবনে সফরে তাড়া না থাকলে সুন্নত নামাজ পড়ি। তাড়া থাকলে পড়িনা।

হজ্বের পর গুলশানে হজ্বযাত্রীগণের নৈশভোজে আমন্ত্রিত উক্ত ধর্মীয় ব্যক্তি আলোচনায় আমার মাধ্যমে উপস্থিত হজ্ব যাত্রীগণের হজ্ব কার্যক্রমের ২টি বিষয় ভুল ধরলেন। একটি হল হজ্বের সফরে মোসাফির হয়েও কেন সুন্নত নামাজ পড়া হল। অপরটি হল আরাফাতে তাবুতে পৃথকভাবে জামায়াতে নামাজ পড়তে গিয়ে জোহর ও আছর একত্রে যোহর ওয়াক্তে পড়া হলনা কেন?

পরবর্তীতে জানতে পারি ঐ সময় উক্ত ধর্মীয় আলোচকের কথায় উচ্চ ইংরেজি শিক্ষিত সম্মানিত হজ্বযাত্রীগণের মধ্যে অনেকেই তাদের হজ্বে বড় ধরনের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে গেল কিনা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। উক্ত নৈশভোজে উপস্থিত থাকা দেশের এলিট গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজের মালিক মরহুম সিরাজুদ্দিন আহমদের সুযোগ্য সন্তান বর্তমানে ডাইরেক্টর সাজেদুল সিরাজ থেকে ফোনালাপে জানতে পারি উপরোক্ত

অবস্থার কথা। সাজেদুল সিরাজ তার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনেও অনুরূপ নৈশভোজের আয়োজন করতে সিদ্ধান্ত নিতে চায়। আমার সাথে আলাপ করেই তাঁর এই নৈশভোজের আয়োজন করেন ২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ শনিবার।

বিশ্বে ১৩০ কোটি মুসলমানের মধ্যে এই উপমহাদেশে ৪০ কোটি মুসলমানের আবাসস্থল। এ উপমহাদেশের কোটি কোটি ধর্মীয় আলেমের মধ্যে অনেকক্ষেত্রে দূরত্ব বা কাদা ছড়াছড়ি থাকলেও ফরজ ওয়াজিব বাদে সুন্নত ও নফল বিষয়ে শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ জন আলেম বহু বিষয়ে একমত। তৎমধ্যে আলোচ্য দুইটি বিষয়ও। উপমহাদেশ সহ বিশ্বের শতকরা ৯০. বা ততোধিক ধর্মীয় বিজ্ঞব্যক্তি একমত যে মুসাফির তথা সফরকালীন সময় সুযোগ থাকলে সুন্নত নামাজ পড়া যাবে এবং সুন্নতের নামাজ পড়তে পারাটাই উত্তম। উক্ত ৯০/৯৫ অনুপাত আলেমের মতামত হল মুসাফির অবস্থায় সুন্নতে মুয়াক্কাদার মর্যাদা এসে দাঁড়াবে সুন্নতে জায়েদায় এবং সুন্নতে জায়েদার মর্যাদা এসে দাঁড়াবে নফলে।

উপমহাদেশে অনুরূপ ৯০ শতাংশের উর্ধ্বের আলেমগণের ঐকমত এই যে, আরাফাতে জোহর ও আসর নামাজ, যোহর ওয়াক্তে পরপর পড়তে একাধিক শর্ত বিদ্যমান। তৎমধ্যে অন্যতম শর্ত হল মসজিদে নমেরার নির্দিষ্ট ইমামের পিছনে এক্তেদা করতে হবে।

হজ্ব সহ ধর্মীয় নানা বিষয়ে যৌবনের প্রারম্ভ থেকে জানতে ও শিখতে সদা সচেষ্ট থাকি। সময়ে সুযোগে ধর্মীয় পুস্তকাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে শিখতে ও বুঝতে তৎপর থাকি। এতে আমার পরিস্কার জানা হয়ে গেছে উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে ৯০ শতাংশের আলেম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, মুসাফির অবস্থায়ও সুন্নত নামাজ পড়া যাবে এবং ৯ জিলহজ্ব আরাফাতে মসজিদে নমেরার ইমাম সাহেবের পিছনে জামাত আদায় করা সম্ভবপর না হলে জোহর ওয়াক্তে জোহর নামাজ ও আসর ওয়াক্তে আসর নামাজ পৃথকভাবে পড়তে হবে। তবে আরাফাতের উক্ত নমেরা মসজিদে ইমাম সাহেবের পিছনে পড়তে সক্ষম হওয়া সুন্নত তথা অতিরিক্ত সওয়াবের কাজ।

গুলশান নৈশভোজের উক্ত আহলে হাদিস সমর্থক ধর্মীয় আলোচক এমনভাবে কথাটা বললেন বলে একাধিক সূত্রে জানতে পারলাম যে, ওনার মতামতই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের মূল মতামত যদিওবা ওনার লিখিত হজ্বের উপর কোন বই পুস্তক আমার হস্তগত হয়নি। উক্ত আলোচকের মতামত প্রকাশের সময় চিন্তা করা উচিৎ ছিল তার এই জোরালো মতামত এদেশের শতকরা ৯০ জনেরও অধিক আলেমগণের বিপরীতে যাচ্ছে। তিনি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না হয় মত কথা বলতে পারতে। ইতিমধ্যে হজ্ব করে আসা শ্রোতাদেরকে হজ্ব নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে না ফেলে পারতেন। তিনিসহ তার মতাবলম্বী শতকরা ৫/৭ জনের মতামত হাদিস শরীফ মতে আর অপরাপর ৯০/৯৫ জন আলেমের মতামত এবং তাদের লিখিত কিতাবাদি হাদিস শরীফের প্রতিকূলে নয়। বরং যাবতীয় মতামত তথা কিতাবাদি হাদিস শরীফ অনুকূলে সৃজিত।

জানা আছে যে, বাংলাদেশের শতকরা ৫/৭ জন ধর্মীয় ব্যক্তি উক্ত আলোচকের মতামত অনুসারী। জানা না থাকলে হয়তো ভুল হত কিন্তু আমারতো তা জানাই রয়েছে। দেশের শতকরা ৯০/৯৫ জন ধর্মীয় বিজ্ঞ আলেমের অনুকরণ না করে শতকরা ৫/৭ জন আলেমের অনুকরণ করতে পারিনা।

এলিট গ্রুপের ডাইরেক্টর সাজেদুল সিরাজের আমন্ত্রিত হয়ে আমার কাছে রক্ষিত কিতাব/গ্রন্থ থেকে ৭/৮টি কিতাব/গ্রন্থ ঢাকায় নিয়ে যাই যেগুলোতে উক্ত ২টি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্তের অনুকূলে উল্লেখ রয়েছে এবং যেগুলোর লেখক বিখ্যাত এবং সুখ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তৎমধ্যে ভারতের সাহারণপুরের গ্রান্ড মুফতি হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ কর্তৃক রচিত মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হজ্ব ও ওমরার মসলা মসায়েল, বাংলাদেশ সরকারের ধর্মমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হজ্ব, ওমরা, যিয়ারত; এ উপমহাদেশ বিখ্যাত সাহারণপুর মাদ্‌রাসার শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রহ.) কর্তৃক লিখিত "ফজায়েলে হজ্ব", হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরফ আলী থানবী (রহ.)-এর অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী কর্তৃক রচিত "হজ্জের মাছায়েল, সম্প্রতি প্রকাশিত দেশবরেণ্য মাসিক মদিনার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান কর্তৃক রচিত তালিমুল হজ্ব, দেশের স্বনামধর্ম দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বায়তুশ শরফ ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষক ও ইসলামী ব্যাংক শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান মরহুম হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) কর্তৃক রচিত তালিমুল হজ্ব ওমরা ও যিয়ারত। শুধুমাত্র হজ্বের উপর এ সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহ সর্বজন স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য। হজ্বের উপর লিখিত উক্ত গ্রন্থ সমূহের পরও দেশের প্রসিদ্ধ বড় বড় আরবী ও উর্দ্দু কিতাবাদীতেও উক্ত ২ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্তের অনুকূলে সুস্পষ্ট মতামত রয়েছে। তৎমধ্যে : ফতোয়ায়ে কাজি খাঁ ৮৩ পৃষ্ঠা ও ১৩৮ পৃষ্ঠা, ফতোয়ায়ে শামী ২য় খন্ড ১৩১, ৫০৫, ৫২০ ও ৬১২ পৃষ্ঠা, ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খন্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত কিতাবাদীও উপমহাদেশ পেরিয়ে বিশ্বের বুকে বহুল পরিচিত, নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য।

সাজেদুল সিরাজের উক্ত দাওয়াতে মাইকের ব্যবস্থা থাকায় গ্রন্থগুলোর সহায়তায় আমার বক্তব্যের মধ্যে হজ্বকারীগণের হজ্ব নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব মুক্ত করতে পেরেছি বলে মনে করি।

উল্লেখ্য ভারত থেকে ১৯৩৬ ইংরেজিতে প্রকাশিত "মুয়াল্লেমুল হুজ্জাজ" হজ্বের এ কিতাবটি আমাদের দেশের বাংলা ভাষায় সহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশে নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসাবে বহুল প্রচারিত।

বিশ্বের পাশাপাশি আমাদের দেশের শতকরা ৯০/৯৫ জন আলেমেদ্বীন অন্যান্য বিষয়ে দূরত্ব থাকলেও হজ্বের বিষয়ে উক্ত "মুয়াল্লেমুল হুজ্জাজ" কেই নির্ভরযোগ্য দলিল হিসাবে মনে করেন। উক্ত বিখ্যাত কিতাবে আমার পরিচালিত হজ্ব কার্যক্রমের

অনুকুলে স্পষ্টতই বর্ণনা রয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সাজেদুল সিরাজের উক্ত দাওয়াতে উপরোল্লিখিত দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে আমার তথ্যবহুল যুক্তি পেশকালীন উক্ত ধর্মীয় আলোচক উপস্থিত ছিলেন না।

আমাদের উচিৎ হবে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থাকা। ধর্ম নিয়ে যতই বাড়াবাড়ি হবে ততই ইসলামের ক্ষতি সাধিত হবে। নিজকে ছোট মনে করলে কম জ্ঞানী মনে করলে ধর্ম বিষয়ে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে কোন অবস্থাতেই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি হবেনা। ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে হিংসা বিদ্বেষ ভুলে আত্মম্ভরিতা পরিহার করে ধর্ম নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি না করে সম্প্রীতিমূলক সহাবস্থানে অবস্থান করা আবশ্যক বলে মনে করি।

পরিবারে মসজিদের প্রভাব

আমাদের দেশে শত শত বছর থেকে লাখ লাখ মসজিদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুলতানী আমল ও মুঘল আমলের কারুকার্য খচিত কালপাথরের পিলারে, চুনসুড়কীর বহু মসজিদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সুলতানী ও মুঘল আমলের কথা দৃঢ়ভাবে বলতে না পারলেও বৃটিশ আমল থেকে দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তি তথা জমিদারগণ তাদের বাড়ির আঙ্গিনায় বা নিকটস্থ পছন্দমত স্থানে মসজিদ তৈরী করেছিলেন। মসজিদ দেখলেই অনেকটা বুঝে আসে কোন্‌টি কোন্ আমলের হতে পারে।

তবে মোঘল,বৃটিশ, পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকের মসজিদ আর বাংলাদেশ আমলের মসজিদের মধ্যে নির্মাণ কৌশল অনেকটা ভেসে উঠে। মোঘল আমলের রাজকীয় ব্যবস্থায় বাদে ব্যক্তি বা পরিবারের উদ্যোগে মসজিদ নির্মাণ অনেকটা বিরল বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ আমল থেকে রাজপরিবার, নবাব পরিবার, জমিদার পরিবার তাদের বাড়ীর আঙিনায় বা নিকটে সুবিধামত স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা অনেকটা স্বাভাবিক রেওয়াজ ছিল। তেমনি হিন্দু রাজা, জমিদারগণেরও বাড়ীর নিকটে মন্দির নির্মাণের রেওয়াজ ছিল। সাথে জনহিতকর কাজ হিসেবে স্কুল, পোস্ট অফিস, মোসাফিরখানা, বাজার, জনসাধারণের জন্য বৃহৎ দীঘি বা পুকুর-এর ব্যবস্থা করার রেওয়াজ ছিল। যেহেতু বর্তমান কালের মত তখন ব্যবসায়ী, শিল্পপতির প্রতিপত্তি যেমন ছিল না তেমনি সাধারণ ধনী লোক ছিল না বললেই চলে। অতএব রাজা, নওয়াব, জমিদারগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদগুলো নানানভাবে আকর্ষণীয় হত পরিবারের ঐতিহ্য নিয়ে।

অপরদিকে রাজা, নওয়াব, জমিদারগণের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ হওয়া বা করারও রেয়াজ ছিল। বিশেষ করে জমিদারগণের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ-এর প্রবণতা বেশী ছিল। যেসব সম্পত্তি প্রজাবিলি তা প্রজাসাধারণ মালিক হয়ে যায়। অপরদিকে যেসব সম্পত্তি খাস দখলী তা জমিদার পরিবারে থেকে যায়। যদিওবা জমিদারগণ তাদের বিশাল সম্পত্তি ভবিষ্যত প্রজন্মের বৃহত্তর স্বার্থে ওয়াক্‌ফ করেছিল কিন্তু ওয়াক্‌ফের শর্তসমূহে মসজিদের স্বার্থ কতটুকু রক্ষা হল তাও বিবেচ্য বিষয়। অপরদিকে, জমিদারের ওয়ারিশগণের ওয়ারিশরা মসজিদের স্বার্থ রক্ষায় তথা রক্ষণাবেক্ষণে কতটুকু সচেষ্ট তাও বিবেচনার বিষয়। পাকিস্তান আমল থেকে ব্যবসায়ী, শিল্পপতিসহ নানা পেশার লোকজন জনসংখ্যা আধিক্য হেতু পৃথক পৃথক মসজিদ নির্মাণে এগিয়ে আসে। তেমনি প্রতি বাজারে ব্যবসায়ীরা মিলেমিশে মসজিদ নির্মাণ ও সম্প্রসারণে তৎপর হতে থাকে।

দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মসজিদকে খুলে নতুনভাবে নির্মাণ বা মোঘল ও বৃটিশ আমলের নির্মাণকে ঠিক রেখে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সারাদেশে গ্রামে-গঞ্জে প্রতি পাড়ায় এক বা একাধিক মসজিদ রয়েছে। তেমনি উপসাগরীয় দেশ থেকে অর্থ এনে নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং পুরাতন মসজিদকে খুলে নতুনভাবে বৃহদাকারের ডিজাইন করে নির্মাণ করা হচ্ছে। অপরদিকে, মসজিদের নামে রাস্তায়, বাজারে ভিক্ষা করাও হচ্ছে। এতিমখানা, মাদ্‌রাসা ইত্যাদির জন্য ভিক্ষা গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু মসজিদের জন্য ভিক্ষা করা গ্রহণযোগ্য নয়। ছন বা টিন দিয়ে নির্মাণ করলেও মহান আল্লাহপাকের ঘর তেমনি আধুনিক নির্মাণ কৌশলে নির্মিত হলেও সে একি মহান আল্লাহপাকের ঘর। অতএব সুন্দর দালান নির্মাণের জন্য ভিক্ষা করা নিন্দনীয় বলা যায়। মসজিদ মহান আল্লাহ পাকের ঘর। প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ বিশেষ ওজর ছাড়া মসজিদে গিয়ে পড়া আবশ্যক। কাজেই প্রত্যেক সচ্ছল পরিবারকে তাঁর বাড়ির/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ভূমি সম্পদসহ যাবতীয় সম্পদের নিকটে নামাজের প্রয়োজনে মসজিদের খেদমত করা জরুরী এবং তা হতে হবে নিজের আর্থিক অবস্থার নিরিখে। বিশেষ করে নিজ বসতবাড়ী থেকে নিকটস্থ মসজিদ হতে হবে আরো সুন্দর মজবুত। নিজ বাড়ীর গুরুত্বের চেয়ে মসজিদের গুরুত্ব থাকতে হবে। তেমনিভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকটে বা সংলগ্ন এলাকায় মসজিদকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে। অপরদিকে, বহু পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমায়। কিন্তু গ্রামের আয়ের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল থাকে। তাদেরকে শহরে থেকেও গ্রামের বাড়ির নিকটস্থ মসজিদের হেফাজতে ও খেদমতে ব্যয় করে যেতে হবে যথোপযুক্তভাবে।

এইত গেল মসজিদের হেফাজতের, মূল্যায়নের কথা কিন্তু বাস্তবতা ও তথা সারাদেশের বহু এলাকায় চষে বেড়িয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যেসব বাড়ির চেয়ে মসজিদ নিম্নমানের সে বাড়ির নানান প্রতিকূলতা দেখা দেয়া স্বাভাবিক বলে মনে করি। যে সমস্ত পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করছে কিন্তু গ্রামের আয় ভোগ করে তারা যদি গ্রামের আয়ের সাথে সাথে গ্রামের মসজিদের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ না করে থাকে তবে শহরে সঠিকভাবে সুখে থাকবে বলে মনে হয় না। যেসব জমিদার বাড়ি মসজিদ থেকে সুন্দরতম ও মজবুত সেসব জমিদার বাড়ি মনে হয় না সাবেক নিয়মে বহাল তবিয়তে আছে। মনে হয় বাড়ির অবস্থা নানান প্রতিকুলতায় নিমজ্জিত। তেমনিভাবে ব্যবসায়ী শিল্পপতিরাও তাদের আয় অনুপাতে, বাড়ি-ঘরের শান শওকত অনুপাতে মসজিদ এগিয়ে থাকতে হবে। নতুবা ঐ পরিবার নানান প্রতিকূলতায় থাকা স্বাভাবিক। মহান আল্লাহপাকের ধন-সম্পদ ভোগ করা হবে আর আল্লাহপাকের খাস ঘরকে অবজ্ঞা করে নিজেরা পরিবার পরিজনকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে তাদের মহান আল্লাহ পাকের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে মানুষের ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা রক্ষায় তথা আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য তিন আমলকে বেশি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। (এক) বাড়ি ও আয়ের উৎসে অনুপাতে মসজিদকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া (দুই) মানবের প্রতি ভাল ব্যবহার করা বিশেষ করে নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, কাজের লোকজনের প্রতি (তিন) দাম্ভিকতা তথা অহংকার পরিহার করা। যে ব্যক্তি পরিবারের সদস্যরা ফরজ, সুন্নত আমলের সাথে এ তিন আমল পালনে সচেষ্ট থাকবে আশা করি মহান আল্লাহ পাক ঐ পরিবারকে সসম্মানে বহাল তবিয়তে রাখবে।

লালবাগ দুর্গে পরীবিবির মাজার ও আমাদের শিক্ষা

পুরাতন ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তরে মোঘল স্থাপত্য লালবাগ দুর্গ অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। সম্ভবত বাংলাদেশ অঞ্চলে এটিই মোঘলদের সমৃদ্ধ স্থাপত্য স্মৃতি। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোঘল ও সুলতানদের বিভিন্ন দুর্গসহ অবকাঠামো দেখার সুযোগ হয়েছিল বারেবারে। বিশেষ করে দিল্লী, আগ্রা, ফতেহপুর সিক্রি, ঔরঙ্গবাদ, দৌলতাবাদ ও লাহোরে মোঘল স্থাপত্য কিল্লাগুলো দেখার সুযোগ হয়। কিন্তু জীবনে অসংখ্যবার ঢাকা যাওয়া হয়ে থাকলেও কোন সময় ঢাকার লালবাগ কেল্লা দেখার সুযোগ হয়নি। গত ফেব্রুয়ারীর (২০০৪) মাঝামাঝিতে ঢাকা যেতে হয়। ঐসময় বিশেষ আগ্রহ নিয়ে দুপুরের দিকে লালবাগ কেল্লা দেখতে যাই। উত্তর গেইটে টিকেট কেটে দুর্গে প্রবেশ করি। যদিওবা এটি কোন পূর্ণাঙ্গ দুর্গ নয়। মোঘল আমলের, বিশেষ করে নবাব শায়েস্তা খানের আমলে পুরাতন ঢাকা শহরে বহু মসজিদসহ মোঘল স্থাপনা নির্মিত হয়েছিল, কালের আবর্তে যার অনেক কিছু হারিয়ে যায়। তেমনি লালবাগ দুর্গের পূর্ব পার্শ্বের বড় অংশে আবাসিক দালান নির্মিত হয়ে দুর্গের একাংশের স্মৃতি হারিয়ে যায়। কেল্লার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে অপব্যবহার ও পরিত্যক্ত হয়েছিল বিধায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বর্তমান কাঠামোতে সাজিয়ে দর্শকদের কিছুটা হলেও মনের খোরাক যোগাতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়। যারা দিল্লী, আগ্রা ও ফতেহপুর সিক্রি দেখেছেন তারা লালবাগ দুর্গকে পূর্ণাঙ্গ দুর্গ বলে শিকার করে নিতে ইতস্ত বোধ করবেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, লালবাগ কেল্লা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অতএব লালবাগ দুর্গ পরিপূর্ণ দুর্গ নয়। ইতিহাসে এটি দুর্গ নামে পরিচিত হলেও এটি নির্মিত হয়েছিল প্রাসাদ দুর্গ হিসেবে।

মোঘল সম্রাট আকবরের আমলে বাংলার এ অংশে তেমন কৃতিত্ব লাভ করা সম্ভব হয়নি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। তবে তাঁর সঠিক অবস্থান ও অবকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়না। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে তাঁর পুত্র শাহজাদা আজম ও নবাব শায়েস্তা খান লালবাগ দুর্গ নির্মাণের সাথে জড়িত বলে ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্রে থেকে জানা যায়। ঐতিহাসিকগণের ধারণা, নবাব শায়েস্তা খানের কন্যা পরীবিবির অকাল ইন্তেকালে তিনি এতই বিমূর্ষ হয়ে পড়েছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি এ দুর্গের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। নবাব শায়েস্তা খানের কন্যা পরীবিবিকে শাহজাদা আজমের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৬৮৬ সালে খুব অল্প বয়সে পরীবিবির মৃত্যু হয়ে যায়। নবাব শায়েস্তা খান দুর্গের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেও নিজ কন্যার কবরকে তাজমহলের অনুকরণে বিশালভাবে সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেন। যেমনটা অনুকরণ করা হয়েছিল ভারতের মহারাষ্ট্রের আওরঙ্গবাদের সম্রাট আওরাঙ্গজেবের স্ত্রীর সমাধিসৌধ। পরীবিবির মাজারকে তাজমহল আকৃতি বলা হলেও তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। তবে নবাব শয়েস্তা

খান তখনকার আমলে খুব ব্যয়বহুলভাবে এ সমাধিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন বলে স্বীকার করে নিতে হবে।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে জানা যায়, ৬০ ফুট দীর্ঘ বর্গাকৃতির সমাধিসৌধ নির্মাণে উত্তর ভারতের তাজমহল থেকে কালো পাথর, চুনার থেকে বেলে পাথর এবং জয়পুর থেকে সাদা মার্বেল পাথর সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল। যদিও নবাব শায়েস্তা খান ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন না ছিলেন বাংলার সুবাদার তথাপি তিনি তাঁর প্রিয় কন্যার কবরকে বিশাল সমাধিসৌধে পরিণত করে যেতে কার্পণ্য করেন নি। পরীবিবির সমাধির ১৩০ ফুট পশ্চিম পার্শ্বে নির্মিত লালবাগ মসজিদ তিন গম্বুজ নিয়ে আজো সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। নিয়মিত জামাত হয় এ মসজিদে। কিন্তু মাত্র ১৩০ ফুট ব্যবধানে দরজা-জানালা আবদ্ধ অপূর্ব প্রাচীন সৌন্দর্যের নিদর্শন পরীবিবির মাজার বা সমাধিসৌধ পড়ে আছে। পরীবিবির সাথে শায়েস্তা খানের পরিবারের আরো ২/৪টি কবর রয়েছে একই সমাধিসৌধের বিভিন্ন কক্ষে। লালবাগ কেল্লা ভ্রমণকালীন সময়ে দেখা যায়, পরীবিবির মাজারের দরজা-জানালা বন্ধ। অতএব, ভিতরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেলাম না। বাইর থেকে কবরবাসীকে ছালাম ও যেয়ারত করলাম মাত্র। দেখতে পেলাম এ এক পুরাতন ঢাকার বিনোদন কেন্দ্রের মধ্যখানে সমাধিসৌধ মাত্র। দুর্গের দায়িত্বরতদের সাথে আলাপে জানলাম, সময়ে সময়ে হাজারের অধিক নর/নারী দুর্গ দেখতে কিংবা বিনোদনের উদ্দেশ্যে ২ টাকা ফি দিয়ে লালবাগ দুর্গে প্রবেশ করে। কেল্লার বিভিন্ন অংশে ঘোরাফেরাকালীন কাউকে দেখলাম না পরীবিবির মাজারে ছালাম দিতে কিংবা যেয়ারত করতে। বরং পূর্ব সংলগ্ন ছায়ায় বসে যুবককে গান করতে দেখলাম।

দুর্গ থেকে বের হয়ে পৃথক পথ দিয়ে লালবাগ মসজিদে গমন করি যোহরের নামাজ পড়তে। ভাবতে থাকি যার প্রচেষ্টায় নির্মিত এ লালবাগ মসজিদ তাঁর মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ চলছে সমাগমের মাধ্যমে। কিন্তু মাত্র ১৩০ ফুট ব্যবধানে তথা মসজিদের সন্নিকটে নির্মিত পরীবিবির বিশাল সমাধিসৌধে কাউকে একবারের জন্য দোয়া দরুদ তো নয়ই, কাউকে ছালামটুকু পেশ করতে দেখলাম না। হায় আফসোস! হায় সমাধিসৌধ!

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীর কথা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জন্য ঢাকায় বা সিলেট শহরে রাষ্ট্রীয়ভাবে কবর ও সমাধিসৌধের সুযোগ ছিল। তিনি তা পরিহার করে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার সংলগ্ন কবরস্থানে সাধারণের মাঝে চিরশায়িতকে পছন্দ করায় দৈনিক হাজার হাজার লোকের অহরহ যেয়ারত পাচ্ছেন। আর যারা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার হয়ে মৃত্যুবরণ করে রাষ্ট্রীয় খরচে অবকাঠামো নির্মাণ করে যদি পরীবিবির সমাধিসৌধের ন্যায় বিনোদনের কেন্দ্রস্থান হয় তবে এর চাইতে অভাগা আর কে হতে পারে? অতএব, সময় থাকতে লালবাগ দুর্গের ভেতর পরীবিবির সমাধি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি।

দেশে তাবাররুক নিয়ে বাড়াবাড়ি

তাবাররুক শব্দটি আমাদের দেশে ধর্মীয় দৃষ্টিতে বহুল প্রচলিত। তাবাররুক মূলত আরবী শব্দ। তাররুক একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন : উচ্ছিষ্ট, বৃদ্ধি পাওয়া, পছ খোরদা, বরকত, হাদিয়া, প্রসাদ ইত্যাদি। কিন্তু অভিধানবিদগণ তাবাররুককে সরাসরি বাংলা অর্থে প্রসাদ বলেছেন, ফার্সিতে বলা হয় পছ খোরদা।

আমাদের দেশে খাবারকে তাবাররুক হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে এবং এ খাবার তাবাররুককে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা চলে। (১) তাবাররুক হিসেবে নতুনভাবে তৈরী করা খাবার (২) খাবারের অবশিষ্টাংশ। নবী পাক (স.) খাবারের শেষাংশে বরকত নিহিত বলেছেন। কাজেই দেশে তাবাররুক এর উদ্দেশ্যে যেমনি খাবার তৈরী করা হয় তেমনি তৈরী খাবারের তাবাররুক হিসেবে অবশিষ্টাংশ অপরকে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে তাবাররুককে বিভিন্ন নিয়তে তৈরী করে থাকে। কোন ধর্মীয় মাসে, কোন ধর্মীয় মাহফিলে, কোন মৃত ব্যক্তির কল্যাণে তাবাররুক নিয়তে খাবার প্রদান করা হয়ে থাকে। খাবার বাদ দিয়েও অনেকে কাপড়চোপড়সহ নানাবিধ জিনিষপত্র তাবাররুক হিসেবে হাদিয়া প্রদান করে থাকে। তবে তাহা খুবই কম সংখ্যক লোকের কাছে প্রচলিত। মুলত তাবাররুক বলতে খাবারকে বুঝানো হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে স্ব-উদ্যোগে সাধারণ নিয়তে সাধারণ সময়ে তাবাররুক ব্যবহার আমার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন কেহ কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে গরু বা ছাগল জবেহ করে খাওয়ানো, ক্ষির বা পায়েস বা ফিরনী তৈরী করে খাওয়ানো, নিজ উদ্যোগে কোন ধর্মীয় মাহফিলকে উপলক্ষ করে খাওয়ানো ইত্যাদি। অপরদিকে, দু'আকিদার লোকজন প্রচলিত তাবাররুককে মূল তাবাররুক বলে গণ্য করতে নারাজ এবং তারা দেশে বর্তমান বহুল প্রচলিত তাবাররুক প্রথাকে বেদাত বলে থাকেন। তাদের দৃষ্টিতে তাবাররুক বলতে মক্কা মোকররমায় আবে জমজম ও মদিনা মুনাওয়ারার খেজুরই তাবাররুক এবং দেশে খাবারের অবশিষ্টাংশ বা শেষাংশকে তাবাররুক বলা যাবে। কিন্তু বর্তমানে বহুল প্রচলিত খাবার তৈরী করে প্রদান করা বা খাওয়ানো বেদাতের শামিল।

এখানে আমার যুক্তি তথা দৃষ্টিভঙ্গি হল যদি কেহ স্বউদ্যোগে সম্পূর্ণ হালাল টাকা দিয়ে কোন ধর্মীয় তথা নেক নিয়তে মুসলমানকে খাওয়ায় তবে তাবাররুক হিসেবে গণ্য হতে বাধাটা কোথায় বোধগম্য নয়। মানুষকে স্ব-উদ্যোগে নেক নিয়তে হালাল অর্থ ব্যয় করে খাওয়ানো তাবাররুক-এর মধ্যে অনায়াসে গণ্য করা

যায়। যে ব্যক্তি তাবাররুকের ব্যবস্থা করে তাদের নিয়ত থাকে অপরকে খাওয়াইয়ে নিজে দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান হওয়া। অপরদিকে যারা তাবাররুককে খেয়ে থাকে তাদেরও নানান নিয়ত থাকে। তবে রোগ থেকে শেফা অন্যতম।

আমাদের দেশে তাবাররুকের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। তেমনি তাবাররুককে নিয়ে বাড়াবাড়িও চলছে। শুধু তাই নয় তাবাররুক নিয়ে চাঁদাবাজিও শুরু হয়ে গেছে। এমনকি তাবাররুক নিয়ে সন্ত্রাসী কাজও শোনা যায়। কোন ধর্মীয় উপলক্ষ যেমন মহররম মাসে আশুরাকে সামনে রেখে, রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদ-কে সামনে রেখে, রবিউসসানী মাসে বড়পীর (রহ.)-কে উপলক্ষ করে এবং রজব মাসে হযরত সুলতানুল হিন্দকে উপলক্ষ করে প্রচুর গরু, মহিষ ও ছাগল জবেহ করা হয়ে থাকে। তেমনি অন্যান্য আল্লাহর ওলিগণকে উপলক্ষ করে বহু সংখ্যক গরু, মহিষ, ছাগল জবেহ করা হয়ে থাকে। অনেকে এসব জবেহ উৎসবকে ওরশ বলে থাকে। অনেক বেকার এবং নামাজসহ ধর্ম থেকে দুরে থাকা ব্যক্তি জবেহ তথা ওরশকে লক্ষ্য করে আয়ের ধান্ধায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। চলে ধর্মের ব্যানারে নীরব চাঁদাবাজি, চলে ধর্মের ব্যানারে নামাজবিহীন ধর্মবিরোধী কাজকর্ম। নামাজসহ ধর্মহীন লোকজন এসব কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে থাকে বেশি। তারা এসব খাবারকে শারীরিক শেফাসহ নানান কল্যাণ নিয়তে খেয়ে থাকে এবং পরিবার পরিজনের জন্য নিয়ে থাকে। আগেই উল্লেখ করেছি, আমাদের দেশে তাবাররুক একটি ভাল উত্তম পদ্ধতিকে বাড়াবাড়ির মধ্যে ধর্মহীনতার পরিচয় দিতেছি। সাধারণের চাঁদার খাবার ভক্ষণ করা তাকওয়ার খেলাফ হবে। যেহেতু দেশে হালালের ছেয়ে হারামের টাকার লোকজন অত্যধিক। নবী পাক বলেছেন, হালালের সাথে হারাম মিশ্রিত হলে সবই হারাম হয়ে যায়। অতএব, তাকওয়া পরহেজগার ব্যক্তির পক্ষে চাঁদার টাকার খাবার তথা তাবাররুক খাওয়া অনুচিত তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। আর নামাজ বাদ দিয়ে মোস্তাহাবী ধর্ম পালনের জন্য চাঁদাবাজি করা ছওয়াবতো নয়ই বরং গুনাহই হবে। কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে খাবার বা ফিরনী তৈরী করে তাবাররুকের নিয়তে কোন নেক উদ্দেশ্যে খাওয়ালে তবে ছওয়াব রয়েছে। কেহ তার মৃত পিতা-মাতা, মুরুব্বী ও কোন মহান আল্লাহর ওলির নিয়তে তাবাররুকের ব্যবস্থা করে থাকলে তবে মৃত পিতা মাতা, মুরুব্বী ও আল্লাহর মহান অলীগণের রুহের প্রতি ছওয়াব বখশিষ হওয়া অগ্রহণযোগ্যের কারণ নেই বরং ছওয়াব। কিন্তু চাঁদাবাজি করে, সন্ত্রাস করে হালাল ও হারাম টাকা মিশ্রিত করে নামাজ তরক করে তাবাররুকের ব্যবস্থা করলে তা ছওয়াবত নয়ই বরং গুনাহ হবে তাতে ইতস্ততের অবকাশ নেই।

অতএব, আমরা যাতে তাবাররুকের পবিত্রতা রক্ষা করি এবং তাবাররুকের নামে অনাচার থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট থাকা চাই।

পিতার মৃত্যু পরবর্তী সন্তানের কৃতকর্ম

গত ক'দিন আগে চট্টগ্রাম মহানগরীতে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে গাড়িযোগে এক অভিজাত আবাসিক এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার পার্শ্বে এক দালানের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বন্ধুটি দুঃখ করলেন এবং আমাকে বললেন কিছুদিন আগে ঐ দালানের মালিক মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে ঐ দালানসহ যথেষ্ট সহায়-সম্পদ রেখে গেছেন তিনি। কয়েকতলা বিশিষ্ট ঐ দালানের বর্তমান মূল্য কম করে হলেও কোটি টাকা হবে। দালানের মালিক মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তার থেকে কয়েক হাজার টাকা পাওনা ছিল গাড়িতে সাথে বসা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর। আমার বন্ধু সমবেদনা প্রকাশ এবং সাথে সাথে পাওনা টাকার কথা সুযোগ বুঝে সন্তান-সন্ততির সাথে আলাপ করবেন ইচ্ছা করে ঐ দালানে যান। আমার বন্ধু ঐ দালানে গিয়ে সন্তান-সন্ততির মুখ থেকে এই ধারণা নিয়ে আসেন যে, তাদের পিতার কর্জ হয়ত কয়েক লাখ টাকা হবে। আমার বন্ধুর ধারণা সন্তানের হা-হুতাশে মনে হয় তাদের পিতার থেকে প্রাপকেরা বাধ্য করা ছাড়া প্রাপ্য দিবে বলে মনে হয় না। যদিওবা পিতা কোটি টাকার দালানসহ আরো বহু সহায় সম্পদ রেখে গেছেন।

আমাদের দেশের প্রায়ই কম-বেশি সবার প্রচেষ্টা থাকে সন্তান-সন্ততিকে সচ্ছল রেখে যাওয়া। এই লক্ষ্যে সুদ, ঘুষ, কালোবাজারিসহ যাবতীয় অপকর্ম করে জীবনে সম্পদ গড়তে ইতস্তত করে না কম-বেশি সকলে। বিশ্বের অন্য দেশের কথা নাইবা বললাম। আমাদের দেশের মানবগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য অর্থ সম্পদ গড়া। জীবন অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী। তারপরও বৈধ-অবৈধ বাছবিচার না করে সম্পদ গড়া কেন? লক্ষ্য একটাই---নিজ পরবর্তী সন্তান-সন্ততি যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে, থাকতে পারে ইজ্জত সম্মান নিয়ে। এই লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষিত লোক হোক, সচেতন নাগরিক হোক, ধার্মিক লোক হোক, ধর্মীয় জ্ঞানী হোক, সমাজে সাধারণ বা সম্মানিত প্রতিষ্ঠিত লোক হোক, সন্তান-সন্ততিকে প্রতিষ্ঠিত করে যাওয়ার জন্য, সম্পদশালী করে যাওয়ার জন্য ইতস্তত করে না। এ লক্ষ্যে সম্পদ গড়তে হালাল-হারাম বাছ-বিচার করে না। যৌথ অংশীদারী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি হলেও এক অংশীদার অপর অংশীদারকে সুযোগ পেলে ঠকাতে সচেষ্ট থাকে। তেমনি যৌথ পরিবারে বা পারিবারিক কর্মকাণ্ডে সম্পদে ও অপরাপর ভাই-বোনদেরকে ঠকায়ে গোপনে বা প্রকাশ্যে নিজের সন্তান-সন্ততির জন্য সম্পদ গড়তে ইতস্তত করে না।

এমনিতে দেশে হালাল রোজগারের লোক শতে ২/৪ জন পাওয়া যাবে কি না বলা

মুস্কিল। তার উপরে নিজে হারাম রোজগার করে সন্তানের জন্য রেখে যেতে কমবেশি মনে হয় সবাই একমত। দেশে কতলোক কতরকম ঠকবাজি করে, হারাম কর্মকাণ্ড করে সম্পদ গড়ছে তার ইয়ত্তা নেই। মানুষ সম্পদের পাশাপাশি লেনদেনে পরিষ্কার থাকতে চাইলেও একশত ভাগ পারা যায় বলে মনে হয় না। হয়ত শতে ২/১ জন পারতে পারে। কিন্তু ৯৫/৯৮ জন ব্যক্তির মৃত্যুকালীন সম্পদের পাহাড় থাকলেও লেনদেন থাকা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, প্রায়ই ক্ষেত্রে মৃত্যু পরবর্তী সন্তানরা পিতার ব্যাপক সম্পদ থাকলেও সে অনুপাতে ন্যূনতম অর্থাৎ সম্পদ অনুসারে শতকরা ৫/১০ টাকা কর্জও শোধ করতে চায় না। দেশে একটি রেওয়াজ আছে মৃত্যুর পরপর জানাজায় সন্তান বা ভাই দাঁড়িয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলবে–তার পিতার/ভাইয়ের কাছে কেউ কিছু প্রাপ্য থাকলে তার সাথে যাতে দেখা করা হয়। তিনি তা পরিশোধ করে দেবেন এবং সাথে সাথে মাফও চাওয়া হয়।

ধর্মমতে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার আর তা হল মানুষ মানুষ থেকে দু'প্রকারের হক তথা প্রাপ্য পেয়ে থাকে। একটি হল আর্থিক অপরটি হল ব্যবহারিক, আর্থিক বলতে টাকা-পয়সা সম্পদ ইত্যাদি। ব্যবহারিক বলতে মুখের দ্বারা, হাতের দ্বারা কারো মনে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকলে। মানুষ লেনদেনে একশত ভাগ পরিষ্কার থাকা যেমনি অসম্ভব তেমনি ব্যবহারে কষ্ট না পাওয়া ব্যক্তিও থাকা অসম্ভব।

অতএব, মানুষ অপরাপর মানুষের আর্থিক ও ব্যবহারিক কর্জ রেখে মৃত্যুবরণ করে থাকে। অপরদিকে হক দু'প্রকারের। এক. আল্লাহতায়ালার হক, অপরটি আল্লাহর বান্দার হক। আল্লাহর হকের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মজিদে কঠোরভাবে বলা হলেও সাথে সাথে ক্ষমা চাইতে জানলে ক্ষমার কথাও বলা হয়েছে বারেবারে। মহান আল্লাহপাক গাফুরুর রহিম, রহমানুর রহিম তা তিনি বারে বারে এরশাদ করে গেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহপাক তার বান্দার হক বান্দা নিজে মাফ না করলে তিনি মাফ করবেন না বলে বারেবারে বলে দিয়েছেন। যদিও মহান আল্লাহ বান্দার হকও মাফ করার ক্ষমতা রাখেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে অতি এবাদতি ব্যক্তি, অতি ধার্মিক ব্যক্তি দেশে কোটি কোটি না হলেও লাখ লাখ পাওয়া যাবে। কিন্তু আল্লাহর বান্দার দু'প্রকারের হক থেকে মুক্ত ব্যক্তি শতে ২/৪ জনও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তারপরও আমাদের মধ্যে ধর্ম পালন নিয়ে নিজেকে নিজে গর্ব করতে অহরহ দেখা যায়।

আল্লাহর বান্দার হকের ব্যাপারে সন্তান-সন্ততিরা জানাযার মাঠে মৃতদেহকে সামনে রেখে উপস্থিত সকলের থেকে ক্ষমা চাইলেও ব্যবহারিক ক্ষমা পাওয়া যাবে। কিন্তু আর্থিক লেনদেন মাফ হবে এরূপ মনে করা উচিত হবে না। হয়ত লেনদেন পরিষ্কার করতে হবে। অন্যথায় ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সন্তান-সন্ততিরা পিতা সম্পদ রেখে গেলেও, পিতার কর্জটুকু দিয়ে দিতে ইচ্ছুক

থাকে না। নানা কথা বলে বাহানা করতে থাকে। মৃত্যু পরবর্তী কর্জ শোধের আশ্বাস দিতে থাকলেও কিছুদিন যেতে না যেতেই সন্তান বা ভ্রাতারা মৃত ব্যক্তির কর্জ রেখে যাওয়ার জন্য প্রকাশ্যে হা-হুতাশ করতে অহরহ দেখা যায়। তারপরেও কেন জানি সন্তান-সন্ততিকে মহান আল্লাহপাকের উপর নির্ভর করে ছেড়ে দিতে আমরা ইচ্ছুক নই। আল্লাহপাকের বান্দা আল্লাহপাক হেফাজত করবেন এই বিশ্বাসটুকু আমাদের মাঝে খুব কমই পাওয়া যায়। আমরা সন্তানদেরকে সম্পদশালী করে রেখে যেতে ভাই-বোনদের ঠকাই, অংশীদারকে ঠকাই, ঘুষ খাই, সুদ খাই বা দিই, কালোবাজারী করি ইত্যাদি ইত্যাদি। ন্যূনতম হালাল সম্পদ হলেও মহান আল্লাহপাক ইচ্ছা করলে সন্তানদেরকে সসম্মানে রাখতে পারে। পিতা না দিয়ে থাকলেও মহান আল্লাহপাক ইচ্ছা করলে পিতার মৃত্যু পরবর্তী সম্পদশালী, ক্ষমতাশালী, ইজ্জতশালী করতে পারে এরকম নজীর দেশে লাখ লাখ রয়েছে। অপরদিকে অগাধ সম্পদ রাখলেও মহান আল্লাহপাক না চাইলে সন্তান-সন্ততিরা অতি দ্রুত সম্পদ হারা হয়ে বা সম্পদ নিয়ে ঝামেলায় পড়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়।

অতএব, নিজে নিজে সচেতন হওয়া চাই। সন্তানের উপর কোনমতেই কোন কিছুতে নির্ভরশীল না হওয়া চাই। সম্পদে হালাল থাকা চাই। লেনদেনের ব্যাপারে সচেতন ও সজাগ থাকা চাই, যাতে করে মৃত্যু পরবর্তী যে কোন কিছুতে সন্তানের উপর নির্ভরশীল হতে না হয়।

ভাসানী নভোথিয়েটারে আল্লাহপাকের বিশালত্ব ভাবা

আমাদের দেশে প্রথমবারের মতো চালু হয় নভোথিয়েটার। কিন্তু প্রতিবেশী ভারতে বহু আগে থেকে নভোথিয়েটার চালু হয়। ভারতের বড় বড় শহরগুলোতে এক বা একাধিক নভোথিয়েটার রয়েছে। দিল্লী, মুম্বাই বাদেও কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, আহমেদাবাদ, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর ইত্যাদির মত বড় বড় শহরগুলোতে নভোথিয়েটার রয়েছে। কলকাতাতে বহু বছর আগে চালু হওয়া নভোথিয়েটারকে হার মানিয়ে সাইন্সসিটিতে আরো অত্যাধুনিক নভোথিয়েটার চালু করা হয়েছে।

বিশ্বের বুকে বহু দেশে এ নভোথিয়েটার রয়েছে, যার সংখ্যা হাজারের উপরে। উন্নত বিশ্বে এমন নভোথিয়েটার রয়েছে, যাতে প্রবেশ করে উপভোগ করতে গিয়ে মনে হবে আপনি নিজেই মহাকাশ ভ্রমণ করছেন। ভ্রমণ করছেন সৌর জগতের বিভিন্ন গ্রহে। আমেরিকার ডালাসে ও হিউসটনের নাসায় এমন অভিজ্ঞতা হয়। তবে প্রথম নভোথিয়েটার দেখার সুযোগ হয়েছিল ১৯৮০ সালে কলকাতা নগরীতে।

গত শতাব্দী থেকে বিজ্ঞান উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যায়। সাথে সাথে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রসহ সৌর জগতের নানান আবিষ্কারের দিকে অগ্রসর হতে থাকে বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানীরা। তবে রাজধানী ঢাকার যথোপযুক্ত স্থানে নভোথিয়েটার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বলতে পারি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার ২৫ বছর পর অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে এসে দেশে তথা রাজধানীতে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং তা বাস্তবায়িত হয়ে গত ২০০৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করা হয়। ১২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত নভোথিয়েটারের মূল হলটি যথোপযুক্ত ও আধুনিক বলা যেতে পারে। কিন্তু ছাত্র, শিক্ষক সমাজসহ সচেতন নাগরিকের সৌরজগতের নানান জ্ঞান অর্জনের জন্য কিছু ছবি বাদে আর কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। যে কারণে দূর-দূরান্ত থেকে আগ্রহী দর্শনার্থী এসে নভোথিয়েটারে প্রবেশ করে প্রায় দেড় ঘন্টা শো দেখে ফিরে যাওয়া বাদে উপভোগ করার জন্য তেমন কিছু নেই বলা যেতে পারে কেবলমাত্র কিছু ছবি ছাড়া।

নভোথিয়েটার করতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে তৎদ্বারা একটি পূর্ণাঙ্গ যাদুঘর তৈরী করা যেত। অথচ তেমন হয়নি। যে কারণে মনে হয় অর্থের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা হয়নি। অপচয় করা হয়েছে বেশি।

মাত্র ২৭৫ সিটের ধারণ ক্ষমতার ৪টি শো-তে এখনো ধারণাতীত ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছিল। বিশেষ প্রতিকূল কারণ ছাড়া মনে হয় কোনদিনই একটা সিটও খালি যাবে

না। নভোথিয়েটার রাজধানী ঢাকার প্রধান আকর্ষণ বললে মনে হয় বাড়িয়ে বলা হবে না। যেহেতু বর্তমান কালের বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের যুগে এই নভোথিয়েটারে প্রবেশ করে বিশাল সৌরজগতের কণা পরিমাণ হলেও ধারণা করা যেতে পারে।

নভোথিয়েটারে ২টি শো দেখানো হয়। ১ম শোটি যথোপযুক্ত এবং দীর্ঘদিন রাখতে হবে মনে করি। কিন্তু ২য় শোটি বাজে বলতে পারি। যেহেতু আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহের মধ্যে বহু প্রাকৃতিক দৃশ্যসহ নানান বিষয়ে দেখাবার সুযোগ রয়েছে। যেমনটা টিভিতে, ডিসকভারী চ্যানেলে রাতদিন ২৪ ঘন্টা দেখানো হচ্ছে। কেন জানি বিশাল অংকের টাকা খরচ করে আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়া ও তানজানিয়া এরিয়ার নানান পশু-পাখি নিয়ে চিত্র দেখার কারণ বোধগম্য নয়। তবে নভোথিয়েটারের কর্মকর্তারা বললেন, তারা চিন্তা করতেছেন শেষের এই পশু-পাখির চিত্র পাল্টিয়ে নতুন চিত্র আমদানী করার। তারা বলল এগুলো আমদানী করতে না কি কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন। তা হতেও পারে। তবে নভোথিয়েটারের ডাইরেক্টর আজো সচিবালয়ে পদ ধরে রেখেছেন এবং তিনি নিয়মিত নভোথিয়েটারে আসতে পারেন না। অপরদিকে ২য় পদ তথা জয়েন্ট ডাইরেক্টার জাতীয় কোন পদ সৃষ্টি করা হয়নি নভোথিয়েটারে। এতে করে তথ্য জানতে গিয়ে কর্মকর্তারা বারেবারে অপারগতা প্রকাশ করতেছিলেন–তার বলা দায়িত্ব নয় বলে।

আমরা পৃথিবী নামক গ্রহে বসবাস করি প্রায় ৬ শত কোটির উপরে মানব সন্তান। তার উপর পশু-পাখি, গাছপালা তো আছেই। সাথে পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর। বিজ্ঞানীরা আমাদের সৌরজগতের মাত্র ১১টি গ্রহ আবিষ্কার করতে পেরেছেন। গ্রহের সাথে রয়েছে নক্ষত্র। আমরা মুসলমানরা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মহান আল্লাহপাককে স্বীকার করি এবং তা ঈমানেরও অঙ্গ। তেমনি হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সবাই সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে থাকেন। আমাদের দেশে সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে না অর্থাৎ নাস্তিক লোক যে নেই তা নয়। তবে তারা শতকরা একজনও হবে কি না বলা মুশকিল। সৃষ্টি যখন হয়েছে অতএব স্রষ্টাও আছে তা স্বাভাবিক কথা এবং বর্তমানের বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে সৌর বিজ্ঞানীরা এখনো মহান আল্লাহপাকের সৃষ্টির কণা পরিমাণও আবিষ্কার করতে পারেনি–তা তাদেরই করা নভোথিয়েটারে প্রবেশ করে তাদের চিত্র দেখলে অনায়াসে বুঝা যায়।

মহাকাশে গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, উল্কা, ধুমকেতু, ছায়াপথ, নীহারিকা, তারকা-মণ্ডলীসহ মহাজাগতিক আবিষ্কারের দিক দিয়ে মনে হয় বিজ্ঞানীরা এখনো শৈশবেই রয়ে গেছেন। মহান আল্লাহপাকের সৃষ্টি যে কত বিশাল, কত মহান, রাজধানী ঢাকার নভোথিয়েটারে প্রবেশ করে শো দেখে অনায়াসে তা অনুধাবন করা যায়। যেমনটা আরও সহজে অনুধাবন করা যায় যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে নাসায় প্রবেশ করে।

বিশ্বের ইতিহাসে হাজার হাজার বছর ধরে নানান কুসংস্কার ছিল চন্দ্র, সূর্য, আকাশের তারকামণ্ডলী নিয়ে। কিন্তু গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানের নানান আবিষ্কারের ফলে হাজার হাজার বছরের যাবতীয় কুসংস্কার ভেস্তে যায়। চন্দ্র, সূর্য, তারকামণ্ডলী তথা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি জগত নিয়ে তাঁরই মহান পবিত্র গ্রন্থ কোরআন মজিদে তিনি আজ থেকে প্রায় সাড়ে ১৪ শত বছর আগে বলে গেছেন যা কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সহায়ক হিসেবে কাজ করে চলেছে।

মহান আল্লাহপাক বলেন, তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান। তিনি বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য, চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। এসবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞেয় নিরূপম। তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন তৎদ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমিতো নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি।

মহান আল্লাহপাক বলেন, চন্দ্র-সূর্য আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে। তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ৬ দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে এদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমাময় বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ।

তিনি (আল্লাহ) তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী ও দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে। আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই নির্দেশের। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন। মহান আল্লাহপাক আরও বলেন, জ্ঞানার্জনের পথে যে নিজেকে নিয়োজিত করে আল্লাহ তার বেহেস্তের পথ সুগম করেন।

আমরা মানব জাতি মহান আল্লাহপাকের সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ জীব। অতএব মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান তথা মানব জাতির ভাববার সুযোগ বেড়েছে ভাসানী নভোথিয়েটারে প্রবেশ করে, মহান আল্লাহপাক কত মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির পরিধি কত বিশাল বিস্তৃত। আমরা শুধুমাত্র তাঁর সৃষ্ট জগতের অতি ক্ষুদ্র পৃথিবী নামক গ্রহে বসবাস করছি। তিনি আমাদেরকে তথা ৬ শত কোটির অধিক মানবগোষ্ঠীকে সার্বক্ষণিক দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা তাঁর তীক্ষ্ণ নজরে রেখেছেন। অতএব, আল্লাহপাকের বিশালত্ব নিয়ে ভাববার পাশাপাশি তাঁর যাতে সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় সেভাবে আমাদের চলতে হবে। আল্লাহপাক আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন। আমিন।

জীবনযাপন ও বয়স্কের ধার্মিকতা

ধর্মের কথা বলতে এমন কিছু কথা আসে যা শোনতে তিক্ত। প্রবাদ বাক্য হলো: হক কথা তিক্ত। তিক্ত হলেও বললাম।

ধর্মমতে, স্বাস্থ্যমতে, প্রবাদমতে, চল্লিশে পূর্ণাঙ্গতা, পঞ্চাশে বার্ধ্যকতা। মানুষের বয়স চল্লিশ হলে শারীরিকভাবে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে এবং মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে বার্ধ্যকতা শুরু হয়ে যায়। বিশেষ ক্ষেত্র বাদে মানুষ ৬০ থেকে ৭০ বছর স্বাভাবিক বেঁচে থাকে। অতপর বেঁচে থাকলেও অস্বাভাবিকভাবে। কিন্তু ৮০ বছর পার হওয়া সক্ষম ব্যক্তি মনে হয় শতকরা একজনও পাওয়া যাবে না আমাদের দেশে।

কাজেই আমাদের দেশে সক্ষম মানুষ বলতে মনে হয় ৬০/৭০ বৎসর পর্যন্ত। ৭০ থেকে ৮০ বছর বেঁচে থাকলেও কম সংখ্যক ব্যক্তি শারীরিকভাবে সক্ষম থাকে। শারীরিক মোহতাজ বা পরনির্ভর হয়ে হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে না-থাকা উত্তম মনে হয়। এতে ইতস্ততার অবকাশ নেই। মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়স হলো প্রাপ্তবয়স হওয়া থেকে পরবর্তী বছরগুলি। এ সময়ের ধর্ম পালন বয়স্কের চেয়ে চল্লিশ গুণ বেশি মর্তবাবান বলা আছে। যেহেতু এ সময় তথা যৌবনকাল মানুষ ধর্ম পালন থেকে বহুলাংশে দূরে থাকে। বাস্তব দিক থেকে গভীরে দৃষ্টি দিলে আমাদের দেশে যৌবনকাল থেকে ধর্ম পালন করা ব্যক্তি কম পাওয়া যাবে। কিন্তু মানুষ যখন ৪০ বা ৫০ বছর পার হয় তখন বেসামাল চলাফেরা, চালচলন হলেও মনের গভীরে মৃত্যুর চিন্তা বাড়তে থাকে। জীবনের অনেক কিছু স্মৃতিতে ভাসে অনেকের মৃত্যু তথা চিরবিদায়ের স্মৃতি মনের গভীরে জাগরুক হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে ধর্মের প্রতি ধাবিত হয়। চল্লিশ বা পঞ্চাশ পার হয়ে অনেকে দাঁড়ি রাখে অনেকে রাখে না। অনেকে সার্বক্ষণিক টুপি মাথায় রাখে, অনেকে রাখে না। তেমনি শারীরিক কাপড় চোপড়েও অনেকে ধর্মীয় আবরণ আনে, আবার অনেকে প্যান্ট-শার্ট পরে ধর্ম পালন করে।

ধর্মপালন করতে গিয়ে নিয়মিত নামাজ পড়া, রোযা রাখা, হজ্ব করা, যাকাত দেয়া, বেশি বেশি এবাদতে সচেষ্ট থাকা, বেশি বেশি নফল রোযা রাখা, আর্থিক সক্ষম হলে বেশি বেশি হজ্ব ও ওমরাহ করা, সাথে সাথে বেশি দান খয়রাত ইত্যাদি করে থাকে। এই বয়সের ধার্মিকগণের দিকে দৃষ্টি দিলে অনেকের পরিবারে ধর্মের প্রভাব পড়েছে আবার অনেকের পরিবারে তার ধর্ম পালনের প্রভাব ফেলতে পারেনি পরিবারের কর্তা হয়েও।

চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর পার হয়েও ধর্ম পালন শুরু হয়ে নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত, নফল রোযা, নফল এবাদত বেশি বেশি করলেও আয় রোজগারের রাস্তা সাবেক নিয়মে থেকে যায়। স্বচ্ছতা আনে না বা আনতে চায় না। যেহেতু স্বচ্ছতা মানে কঠিন আমল। বেশি বেশি নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত, নফল রোযা, পালন করা বেশি বেশি এবাদত দান, খয়রাত অর্থাৎ ধর্মকাজে বেশি টাকা ব্যয় সহজ। কিন্তু বড়ই কঠিন আয়ের স্বচ্ছতা ফিরে পাওয়া।

বয়স্কের ধর্ম পালন শুরু করতে গিয়ে দেশে একটি বাস্তবচিত্র বেশি বেশি দেখা যায়। আর তা হলো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি। বয়স্ক হয়ে ধর্ম পালন করতে গিয়ে কেহবা ইসলামী আন্দোলন করে দেশে সহসা ইসলামী হুকুমত কায়েম করে ফেলতে চায়। প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে নিতে ইতস্তত করে না। তেমনিভাবে ধর্ম বুঝতে মনে হয় ধর্মীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তা বুঝেনি তিনি যতটুকু বুঝেছেন। যারা ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে থাকে তাদের ঈমান আছে কি না সন্দেহ মনে করে থাকে। তেমনিভাবে বয়স্ক হয়ে ধর্ম পালন করতে গিয়ে অনেকে সুন্নী আকিদা পোষণ করে থাকে। এতে করে তার বিশ্বাস জন্মে তার মত কেহ ধর্ম বুঝেনি এবং যারা এই আকিদা পোষণ করে না তারা ঈমান রাখে কি না ফতোয়া তালাশ করতে চায়। তেমনিভাবে যারা বয়স্ক হয়ে আল্লাহর রাস্তায় সময় দেয় তথা ঘনঘন চিল্লা দেয়া শুরু করে এবং রাতদিন ঐ চিল্লায় বিভোর থাকে। তাদের ধারণা জন্মে যারা তবলীগ করে না তাদেরকে ঈমানদার বলা যাবে কি না?

বয়স হয়ে ধর্ম পালন করতে গিয়ে আমাদের দেশে অনেকের ক্ষেত্রে এ বাস্তব চিত্র পরিলক্ষিত হবে। এক প্রবাদ আছে–"অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী"। বয়স্ক হয়ে হঠাৎ করে ধর্ম পালন করা শুরু করে নিজেকে নিজে অতি ধার্মিক, অতি পণ্ডিত মনে করা মারাত্মক দোষে দুষ্ট বলা যাবে এবং ধর্ম পালন করতে গিয়ে নিজে বেশি বুঝে মনে করে নিজের আকিদা থেকে অপরাপর আকিদার প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করা গেমারাহির সামিল হবে। শুধু তাই নয়, কয়েক বছরের ব্যবধানে ধর্ম পালন করে নিজেকে নিজে আল্লাহর বড় ওলি মনে করে ফেলে। সব সময় ধর্ম বিষয়ে আলাপে আকিদা নিয়ে বাড়াবাড়ি রীতিমত অভ্যাসে পরিণত এবং আরো মারাত্মক যে, অপরের কাছে নিজেকে আল্লাহর ওলি জাহির করতে ইতস্তত করে না।

যৌবনকালে ধর্ম থেকে দূরে থাকলেও বয়স বাড়ার সাথে সাথে ধর্ম পালন করতে গিয়ে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা চাই। তেমনি নিজেকে নিজে বড় মনে না করা চাই। মনে না করা চাই নিজেকে নিজে ধর্মীয় পণ্ডিত হওয়া। আমাদের মনে রাখতে হবে বয়স্কের ধর্ম পালন যৌবনকালের ধর্মপালন-এর সাথে তুলনা হতে পারে না। যেহেতু আল্লাহর রাসূল (স.) পরিষ্কার বলে গেছেন হাশরের ময়দানে আল্লাহপাকের পাঁচটি প্রশ্নের সদ্‌উত্তর দিয়ে পার পেতে হবে। আল্লাহপাকের বিশেষ ক্ষমা অন্য কথা। ঐ পাঁচটি প্রশ্ন মূলত যৌবনকালকে কেন্দ্র করে বলা যেতে পারে। যেমন : ১) আমাদের জীবনটা কিভাবে কাটানো হয়েছে---ভাল না মন্দ, অতএব এতে যৌবনকাল অনায়াসে এসে যায়। ২) যৌবন শক্তি কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে

এতেও যৌবনকাল এসে যায়। ৩) কিভাবে ধনদৌলত অর্জন করা হয়েছে অর্থাৎ আয় কি হারাম না হালাল, এতেও যৌবনকাল নিহিত রয়েছে বার্ধক্যের সাথে সাথে। ৪) কিভাবে ঐ ধন সম্পত্তি ব্যয় করা হয়েছে, এতেও যৌবনকাল জড়িত এবং শেষ প্রশ্ন হলো জ্ঞান অনুপাতে অর্থাৎ এলম অনুপাতে আমল করা হয়েছে কি না। এতেও বার্ধক্যের সাথে সাথে যৌবনকাল জড়িত। একালে একটি ব্যাপার বেশি বেশি চোখে পড়ে, তা হলো বার্ধক্যের ধর্ম পালনকারীদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেও যৌবনকালের আয় নিয়ে কথা বলতে চায় না। এ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলে। যেহেতু এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হালাল-হারাম বাছবিচার না করে সুদের দুর্গ থেকে সুদী টাকা নিয়ে ব্যবসা/শিল্প গড়া, ঘর করা, কালোবাজারী করে সম্পদ গড়া, চাকুরী জীবনে অবৈধ আয় করা, বার্ধক্যে ধর্ম পালন করতে গিয়ে অনেকে এসব কিছু বেমালুম ভুলে যায়।

হারাম টাকার ঘরে ঘুমায়ে হারাম টাকার সম্পদে জীবন চলবে। অপরদিকে, অতি ধার্মিক হয়ে আল্লাহর ওলি বনবে তা হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে এক ব্যক্তি বলেন, যৌবনকালের হারাম নিয়ে যা হবার হয়ে গেছে এখন আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে আর কি? আর এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বলেন, হারামের দালানে জীবনযাপন করে হারামের সম্পদে বার্ধক্য জীবনযাপন করে মাফ চাওয়া মানে আল্লাহর সাথে মসকরা বাদে আর কিছু নয়। আগে হারামের দালান সম্পদ ছাড়েন, তারপর আল্লাহর কাছে কাঁদেন।

আল্লাহপাক গফুরুর রাহিম রাহমানির রাহিম। তিনি ইচ্ছা করলে যে কেহকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু ক্ষমা করার মত পরিবেশ, অবস্থা হওয়া এটিও একটি প্রশ্ন। কাজেই যৌবনকালের হারাম সম্পদ পরিহার করে ক্ষমা চাওয়াটা মনে হয় উত্তম হবে। যদিওবা হারাম সম্পদ পরিহার করে বা ত্যাগ করে ক্ষমা চাওয়াটা কঠিন।

আমাদের উচিত হবে, বার্ধক্যে ধর্মপালন করতে গিয়ে যৌবনকালের অপকর্মের, ধর্ম থেকে দূরে থাকার কথা স্মরণ করে মনে মনে লজ্জিত থাকা। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, ধর্ম পালন করে নিজেকে গর্বিত মনে করা উচিত হবে না বলে মনে করি।

মানবজীবনে হালাল হারামের গুরুত্ব

ইসলাম মানব সম্প্রদায়ের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আমাদের চলমান ব্যবস্থায় হালালের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের গ্রহণ করা খাদ্যগুলো হওয়া চাই হালাল। কোরআন, হাদিস ও ফিকাহশাস্ত্রের কিতাবে যেসব বিষয়কে হারাম বলা হয়নি এবং ভোগযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, তা-ই হালাল। নবী করিম (সা.) হালাল রুজি অন্বেষণ করাকে ফরজ বলেছেন। তিনি সাহাবাগণকে হালাল বা বৈধ পেশায় জীবিকা নির্বাহের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। হালাল খাদ্য মানুষের দেহ ও মনকে পবিত্র রাখে। পক্ষান্তরে হারাম খাদ্যের কুপ্রভাবে মানব হৃদয়ে মরিচা পড়ে যায়। নবী পাক (সা.) বলেন, 'যে হালাল দ্রব্যে হারামের সংমিশ্রণ নেই, কোনো ব্যক্তি যদি তেমন হলাল দ্রব্য একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ভক্ষণ করে, আল্লাহপাক তার অন্তরকে জ্যোতির্ময় করে দেন এবং তার অন্তরে হেকমতের উৎস প্রবাহিত করে দেন।'

পবিত্র কোরআনে হালাল খাদ্য গ্রহণ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে : হে মানবজাতি, দুনিয়ার বুকে হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ কর' (১৬৮নং আয়াতাংশ/২)। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে : 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ কর, যেগুলো আমি তোমাদের রুজি হিসবে দান করেছি এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করে থাক' (১৭২/২)। এ বিষয়ে মহারাব্বুল আলামীন তাঁর নবী-রসুলগণকেও নির্দেশ দিয়েছেন : 'হে রাসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং নেককর্ম করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত' (৫১/২৩)।

বাস্তবতা যখন এই, তখন হারাম খাদ্য ভক্ষণে কৃত ইবাদত কোনোক্রমেই মহান মাবুদের দরবারে গৃহীত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। খাদ্য হালাল হলে নেক কাজের তওফিক আপনাআপনি বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাদিস শরীফে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধুসরিত থাকে। তারপর আল্লাহর সামনে দোয়ার জন্য হাত উত্তোলন করে ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ বলে ডাকে: কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এ ধরনের লোকদের দোয়া কীভাবে কবুল হতে পারে? (কুরতুবি)।

হজরত সা'আদ (র.) নামের জনৈক সাহাবা একদিন আরজ করলেন : 'ইয়া রসুলুল্লাহ, আমার জন্য দোয়া করুন, আমি যে বিষয়ের জন্য আল্লাহপাকের দরবারে প্রার্থনা করি তা যেন কবুল হয়।' জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হালাল

খাদ্য ভক্ষণ কর, তাতেই তোমার সব দোয়া কবুল হবে।' হাদিস শরিফে আরো বর্ণিত আছে : 'কোনো ব্যক্তি যদি ১০ দিরহাম মূল্যের বস্তু খরিদ করে এবং তার মধ্যে মাত্র একটি দিরহাম হারামের থাকে, তাহলে যতদিন পর্যন্ত সেই বস্তুখানি ওই ব্যক্তির দেহে থাকবে ততদিন তার নামাজ কবুল হবে না।' নবী পাক বলেন, যে ব্যক্তি হালাল জীবিকা তালাশ করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে রাতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, আর সব পাপ মার্জিত হয়ে যায় এবং এই ব্যক্তি পাপহীন অবস্থায় নিদ্রা যায়। নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান করলে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তার ওপর অতিশয় সন্তুষ্ট হন।' অন্যত্র বলেন : 'ইবাদতের দশটি অংশ আছে, তার মধ্যে নয়টি কেবল হালাল জীবিকা অনুসন্ধান করা।' পক্ষান্তরে, হারাম উপার্জন বিষয়ে সতর্কবাণী হিসেবে বলেন : 'সুদের একটি দিরহামের পাপ ত্রিশবার জেনা করার পাপের চেয়েও অধিক গুরুতর।' সব হালালই পবিত্র। তবে কিছু কিছু হালাল অন্যান্য সাধারণ হালাল অপেক্ষা শ্রেয়তর পবিত্র। তদ্রুপ সব হারামই মন্দ এবং কিছু কিছু হারাম অন্যান্য সাধারণ হারাম অপেক্ষা অধিকতর মন্দ। ফকিহগণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া হালাল অথবা হালামগুলোই সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের হালাল কিংবা হারাম। হালাল অথবা হারামের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে সালেহীনদের বর্ণিত স্তর। এক্ষেত্রে মুফতি বাহ্যিক অবস্থা দেখে হালাল হওয়ার রায় দিয়েছেন সত্যি: কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সন্দেহমুক্ত না হওয়ায় সালেহীনগণ এ ধরনের বস্তুসামগ্রী গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এ প্রসঙ্গে নবী পাক (স.) বলেন, 'হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর যেসব বিষয় উভয়ের মাঝামাঝি রয়েছে তা সন্দেহপূর্ণ।' হালাল অথবা হারামের তৃতীয় স্তর হচ্ছে, ফতোয়া বা সন্দেহ হারাম সাব্যস্ত করে না: কিন্তু হারাম পর্যন্ত গড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এ ধরনের বস্তুসামগ্রী গ্রহণে বিরত থাকা এবং চতুর্থ স্তর হচ্ছে কোনোক্রমেই হারাম পর্যন্ত গড়ানোর সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ইবাদতের সহায়ক হওয়াও উদ্দেশ্য নয়। এ ধরনের খাদ্য থেকে বিরত থাকা। আর বিরত থাকার এ পর্যায়কে বলা হয় সিদ্দিকগণের মকাম।

মানুষ যখন হারাম অর্জনের দিকে ধাবিত হয়, তখন এর ক্ষতিকর প্রভাব বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দেখা দেয়। বিনষ্ট হয় শান্তি, সমৃদ্ধি ও ঐক্য। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যতোই চেষ্টা করি না কেন, নির্ধারিত রিজিকের অতিরিক্ত কিছু পেতে পারি না এবং হারাম উপার্জনের মাধ্যমে নিজেদেরই ধ্বংসের পথে ধাবিত করছি। মহান রাব্বুল আলামীন এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশিত বা প্রদর্শিত পথে, নাকি চির অভিশপ্ত শয়তানের পথে রিজিকের সন্ধান করব, তা আমাদের সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী হিসেবে জাহান্নামের পথ সুগম করাটা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। হারাম বা ইবলিশ প্রদর্শিত পথ প্রসঙ্গে হজরত সুফিয়ান সাওরি (র.) বলেন, 'হারাম মাল থেকে সদকা খয়ারাত করা আর পবিত্র করার উদ্দেশ্যে অপবিত্র বস্তু মূত্র দ্বারা ধৌত করা একই।' এ প্রসঙ্গে নবী করিম (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি হারাম মাল সঞ্চয় করল, পরে তা দান

করে দিলেন, সে তার কোনো সওয়াব পাবে না। তার হারাম উপার্জনের পাপ তো তার ওপর বোঝা হয়ে চাপবেই।' দাইলামি সূত্রে বর্ণিত, নবী পাক (স.) বলেন, 'কেউ যখন হারাম মাল ব্যয় করে হজ্ব করতে যায়, আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা বলে, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসে–'তোমার এ হাজির গ্রহণযোগ্য নয়। তোমার জন্য কোনো সৌভাগ্যও বরাদ্দ নেই।' হজরত ইবনে আব্বাস (র.) বলেন, 'আল্লাহতায়ালা এমন ব্যক্তির নামাজ কবুল করেন না, যার পেটে হারাম বিদ্যমান হয়।'

মূলকথা হচ্ছে, হারাম বস্তুসামগ্রী থেকে বেঁচে থাকা ফরজ এবং মুশতাহাব (সন্দিহান) বস্তুসামগ্রী থেকে বেঁচে থাকা পরহেজগারীর নিদর্শন। হালাল অর্জনে থাকা চাই নিজের দৃঢ় মানসিকতা। মহান মাবুদ আমাদের তওফিক দান করুন সত্য ও সহিপথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য। আমিন।

জুমাতুল বেদা

জুমাতুল বেদা তথা রমজানের শেষ জুমা। আজ যেমনি পবিত্র দিন তেমনি ধর্মীয় আবেগঘন পরিবেশের দিন। আজ সকাল থেকেই বিশ্বের মুসলমানগণ জুমার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে রত থাকবে। থাকবে ধর্মীয় মন-মানসিকতা নিয়ে।

বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে এমন ব্যক্তি কম পাওয়া যাবে যে আজকের জুমা তরক করবে। যেহেতু আজ অত্যন্ত মোবারক দিন। আজ মসজিদে উপচেপড়া সমাগম হবে। মুসল্লীর সমাগম বেড়ে যাবে। বহু মসজিদে মুসল্লী সংকুলান না হয়ে চত্বরে রাস্তায় কাতার হবে।

আজ জুমার আগে-পরে বিশেষ নফল নামাজ ও বিশেষ দোয়াতে মগ্ন হবে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ। বিশ্বের বহু দেশে লক্ষ লক্ষ নারীরা জুমাতুল বেদাতে শরিক হতে পারলেও আমাদের দেশে এখনো সে পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি, বড় বড় শহরের দুই একটি মসজিদ বাদে। একালে এদেশে নারী জাতি মসজিদে গিয়ে জামাত পড়তে পারে না। যদিও উভয় হারম শরীফে লক্ষ লক্ষ নারী দৈনিক জামাত পড়তে সক্ষম হচ্ছে। বিশ্বের বহু দেশে নারীরা মসজিদের এক পার্শ্বে পর্দাসহকারে ইমামের পিছনে জামাতে শরীক হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশের প্রতিকূল পরিবেশ ও মসজিদের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিনিয়ত নামাজী নারীগণকে নামাজ কাজা করতে হচ্ছে ধর্মীয় গোঁড়ামীর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে।

আজকে ইমাম সাহেব বিশেষ খোৎবা দিবেন। খোৎবায় পবিত্র রমজান মাসকে যেমনি বিদায় জানানো হবে তেমনি নছীহতের পাশাপাশি বিশেষ দোয়া করা হবে। আজ মসজিদুল হারমে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সমাগম হবে। সমাগম হবে কম করে হলেও ১২/১৪ লক্ষ নর-নারী। বিশাল মসজিদুল হারমে জুমাতুল বেদায় শরীক হবে এ বিপুল সংখ্যক মুসল্লী। মসজিদুল হারমের চতুর্দিকের বিশাল চত্বর পেরিয়ে রাস্তা, দালানে জামাত সম্প্রসারিত হবে। তেমনি মসজিদে নববীতে ধারণাতীত সমাগম হবে। সমাগম হবে কম করে হলেও ৮/১০ লক্ষ নর-নারী। আমাদের দেশের বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে কয়েক লাখ নামাজী জামাতে শরীক হবে। উত্তর-দক্ষিণ দুইদিকের রাস্তায়ও জামাত সম্প্রসারিত হবে। তেমনি চট্টগ্রাম মহানগরীর বড়বড় মসজিদগুলোতে ধারণাতীত সমাগম হবে।

রমজানের আবেগঘন পরিবেশ তথা রমজানের ধর্মীয় পরিবেশ আজ অঘোষিতভাবে শেষ হবে। যদিওবা অনেকের ক্ষেত্রে ১৫ রমজানের পর ঈদের খুশীর পরিবেশ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু জুমাতুল বেদার পর বাকি কয়দিন রমজান মাসে রোজা বহাল থাকলেও রোজার ধর্মীয় পরিবেশ বহাল থাকে বলা যাবেনা

ঈদের খুশীর ধাক্কার কারণে, একমাত্র এতেকাফে থাকা ব্যক্তিগণ বাদে। এ সময় কম লোক ধর্মীয় পরিবেশ রক্ষা করে চলে। যদিওবা কম/বেশী সবাই রোজা রেখে থাকে। আজকের পর থেকে মসজিদের সমাগম কমে যাবে। তারাবীহ্‌কে নিষ্প্রাণ মনে হবে সমাগম কম হবার কারণে।

আজ থেকে অঘোষিত ঈদের ছুটি শুরু হয়ে যাবে ২/১টি রাষ্ট্রীয় জরুরী দপ্তর খোলা থাকলেও। ব্যাংক, ডাকঘর তথা জরুরী সার্ভিস বাদে আজ থেকে ১০/১৫ দিনের জন্য সারাদেশের অফিস-আদালত, কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য নিষ্প্রাণ থাকবে। তবে গ্রামাঞ্চলে আজ থেকে ১০/১৫ দিনের জন্য শহর থেকে বাঁধভাঙ্গা মানবস্রোত গিয়ে উৎসবের আমেজ বিরাজমান থাকবে। অপরদিকে, শহরগুলি থাকবে এ ১০/১৫ দিন নিষ্প্রাণ কর্ম কোলাহলে। ঈদকে সামনে রেখে অধিকাংশ পরিবারের কর্তা ব্যয়-বাজেট ঠিক রাখতে না পেরে হিমশিম খাবে। পরিবারের সদস্যদের চাপ বাড়বে কর্তার উপর, নানান কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানোসহ নানান খরচের আবদারের চাপে।

এক্ষেত্রে ২ নম্বরী কামাইওয়ালাদের তেমন অসুবিধা হবার নয়। যেমনি আমাদের দেশে ২ নম্বরী টাকা দিয়ে ঈদ করা, ধর্ম পালন করা সম্পূর্ণ জায়েজ প্রচলিত রেওয়াজ মতে। ধর্মমতে কঠোর নিষেধ থাকলেও একথা মুখ দিয়ে সহজে বের হবে না প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে।

আজ জুমাতুল বেদা থেকে দানের হাত সম্প্রসারিত করা হবে। গরীবগণ খুশিতে থাকবে দান পাচ্ছে বলে। তবে গরীবদের খুশী ঠিক থাকলেও দানের টাকা ২ নম্বরী হলে সওয়াব তো নয়ই বরং ঈমান নিয়ে টানাটানি হবে।

আজ জুমাতুল বেদা থেকে ঈদকে সামনে রেখে দেশে কোটি কোটি টাকা দান-দক্ষিণায় ব্যয় হবে। কাপড়-চোপড়, সেমাই-চিনি, নগদ টাকায়, অনেকের বাড়ীতে খাওয়ানোর ব্যবস্থাও হবে। ঈদের দিন এবং এর পর কয়েকদিন খাওয়া-দাওয়া আতিথেয়তায় সচ্ছল ব্যক্তিগণের বাড়িতে উৎসবের আমেজ বিরাজ করবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঈদের উৎসব একেক প্রকারের হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সেমাই, পায়েস ও ঘরে বানানো নাস্তা দিয়ে অতিথির আতিথেয়তার রেওয়াজ ছিল। হালে তা পরিবর্তন হলে চটপটি, মুরগী-পোলাও, গোস্ত-পরটাসহ নানান ঝালখাদ্যে রূপ লাভ করে। তবে ঈদকে সামনে রেখে ধনী সচ্ছল পরিবারের চেয়ে গরীব দুঃখীদের কপাল খুলে যাবে সাময়িকভাবে হলেও। দেশে প্রায় অতি গরীব পরিবারে একাধিক কাপড়-চোপড় পাবেই। সাথে সাথে যাকাত-ফিতরার টাকাসহ খাবারের নানান কিছু পেয়ে থাকবে।

তবে অবস্থাভেদে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে তারতম্য হবে স্বাভাবিক। যে এলাকায় সচ্ছল পরিবার বেশি সে এলাকার গরীবরা দান পাবে বেশি। অপরদিকে যে এলাকায় সচ্ছল পরিবার কম থাকবে, সে এলাকার গরীব পরিবাররা দান কম পাওয়া স্বাভাবিক। দেশে ঈদকে সামনে রেখে দানের হাত বাড়াবেনা এমন সচ্ছল পরিবার

কম পাওয়া যাবে। হয়তো কৃপণ জাতীয় লোকেরা দান করতে নিরুৎসাহিত হবে। তাই তারা ঈদকে সামনে রেখে নিজেকে, পরিবারকে গরীব দুঃখীদের কাছ থেকে দূরে রাখবে বা থাকবে।

আজ জুমাতুল বেদা থেকে মসজিদ এক বছরের জন্য সাবেক নিয়মে ফিরে যাবে। যদিওবা রমজানের প্রারম্ভে আল্লাহপাকের কাছে গত জীবনের পাপের কথা বলে, ক্ষমা চেয়ে ওয়াদা করা হবে, ওয়াদা করা হবে নামাজ কাজা করবে না নিয়মিত পড়বে বলে। পরিবারবর্গকে ধর্ম পালনে রমজানের মত সারাবছর বহাল রাখবে, হালাল রোজগারে থাকবে ইত্যাদি রমজানের প্রারম্ভে আল্লাহপাককে সামনে রেখে কত কথা, কত ওয়াদা করা হবে। কিন্তু অনেকেই ১৫ রমজান হতে এবং অধিকাংশ আজ জুমাতুল বেদা হতে সাবেক নিয়মে ধর্ম পালনের কথা যেমনি ভুলে যাবে, তেমনি হালাল-হারাম পার্থক্যের কথাও ভুলে যাবে, ভুলে যাবে আল্লাহপাকের সাথে ওয়াদা পালন করার কথা। ফলে ঈদের আমেজে ও ঈদের পর আগের মত ধর্ম পালন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। তবে রমজানকে সামনে রেখে এবং রমজান পেয়ে আত্মশুদ্ধির কথা ভেবে অনেকের স্পষ্ট ধর্ম পালনে পরিবর্তন হচ্ছে না তা নয়। তবে এ ভাগ্যবানগণের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

পবিত্র রমজান মাস তথা আত্মশুদ্ধির মাসে নিজেকে শুদ্ধ করতে এ এক সুযোগ মহান আল্লাহপাকের তরফ থেকে। আমাদের উচিত হবে এ আত্মশুদ্ধির মাসে নিজেকে নিজে শুধরিয়ে নিতে মহান আল্লাহপাকের দিকনির্দেশনা মতে জীবনকে পালিত করতে সচেষ্ট থাকা।

এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি

সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিত্বগণের পাশাপাশি ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের সাথেও সমান্তরালে কথাবার্তা উঠাবসা হয়ে থাকে। পবিত্র কোরআন মজীদের তরজমা তথা অর্থ পড়ে মনের গভীরে একটি বিশেষ প্রশ্ন জাগরুক হয়। এ প্রশ্ন নিয়ে দেশের বিজ্ঞ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের মধ্যে কম করে হলেও ৫/৭ জনের সাথে মত বিনিময় করি। উক্ত বিষয়ে আমার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে তাঁরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন বলে মনে হয়েছিল।

আমার বাসায় সাধারণ শিক্ষিত লোকজনের আসা-যাওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণেরও আসা-যাওয়া হয়ে থাকে।

সম্প্রতি আমার বাসায় চট্টগ্রামের একজন বিজ্ঞ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সাথে একটি প্রসঙ্গে খোলামেলা আলাপ করি। আর তা হল, "মানবের হক" তথা অধিকার নিয়ে। ধর্মমতে "পরের হক" বলে একটা কথা রয়েছে, পরের হক নিয়ে বহুমুখী ব্যাখ্যা করা যায়। তথা পরের সম্পদ আত্মসাৎ করা, ঘুষ খাওয়া, বিচারে বা দায়িত্ব পালনে পক্ষপাতিত্ব করা, চাকুরিতে ফাঁকি দেওয়া, প্রতিবেশিকে ইচ্ছাকৃত কষ্ট দেওয়া, সীমানা নাড়াচাড়া করা তথা নিজের সীমানা বর্ধিত করা, কথা ও কাজে অপরকে কষ্ট দেওয়া, ক্ষমতার অপব্যবহার করা ইত্যাদি নানা বিষয়ে হতে পারে।

উক্ত সকল বিষয় মানবের হক তথা অধিকারের বিষয়ের মধ্যে পড়ে। এতে মুসলিম- অমুসলিম ভেদাভেদ নেই।

প্রশ্ন হল পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহপাক ঈমানের পর নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাতসহ নানা বিষয়ে পালনের জন্য দিকনির্দেশনার পাশাপাশি কঠোর হুঁশিয়ারীও উচ্চারণ করেছেন। সাথে সাথে শাস্তির কথাও বলেছেন, এমনকি এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করলে ৮০ হোকবা তথা লক্ষ লক্ষ বছর দোজখের আগুনে জ্বলতে হবে উল্লেখ করা আছে।

পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহ পাকের দিকনির্দেশনা সমূহ না মানলে কঠোর শাস্তির পাশাপাশি ক্ষমার কথাও বারে বারে উল্লেখ করা আছে। শুধু তাই নয় আল্লাহপাক গফুরুর রহীম ও রহমানুর রহীম হিসাবে শাস্তি প্রদানের চেয়ে যে ক্ষমার হাত বহুগুণে সম্প্রসারিত তাও মহান আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন।

অপরদিকে, আল্লাহর বান্দা তথা সৃষ্টিকূলের হক তিনি মাফ করবেন না যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ঐ সৃষ্টিকূল মাফ না করে, তাও স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেছেন, যদিওবা সৃষ্টিকূলের হক মাফ করে দেওয়া আল্লাহপাকের ক্ষমতার বাইরে নয়। তারপরও

তিনি নিজের আওতায় তা না রাখার জন্য স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ অপরের হক বাদে ঈমানদারের যাবতীয় কিছু মহান আল্লাহপাকের ক্ষমার আওতায় রয়েছে এবং তিনি চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন বলে বহুবার উল্লেখ করেছেন।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে প্রশ্ন করি ২ জন লোক ঈমানদার, তৎমধ্যে একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হয়তো বড় মসজিদের খতীব নতুবা বড় মাদ্‌রাসা প্রধান বা পীর সাহেব, মুফতি সাহেব সুফী সাহেব, ধর্মীয় লেবাস যথাযথ, রাত-দিন ইবাদত তথা নামাজ রোজায় কালাতিপাত করতেছেন। কিন্তু তাঁর হালাল হারাম তথা মানবের হকের কোন বাছবিচার নাই যা প্রকাশ্য তথা স্পষ্ট।

অপরদিকে অন্যজন ঈমানদার-নামাজ, রোজা নাই, টুপি দাড়ি তথা ধর্মীয় লেবাস নাই, কিন্তু মানবের হক তথা হালাল-হারাম পার্থক্য করে চলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ। এ উভয় প্রকারের ঈমানদারের মধ্যে উত্তম কে হবে?

আমার এ প্রশ্নে উপস্থিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যান মনে হচ্ছিল। একটু চিন্তা করে আমাকে বললেন, তিন বিষয়ের সমন্বয়ে ঈমান যথা–

১. মুখে অবলীলায় বলা ২. অন্তরের অন্তঃস্থলে স্বীকার করা ৩. বাস্তবে পালন করা। তাঁর কথার উত্তরে বললাম, উভয় ব্যক্তি মুখে স্বীকার করতেছে, অন্তর থেকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু বাস্তবে পালনের ক্ষেত্রে একজন নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ধর্মীয় লেবাস ও নানান এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত।

অপরজন ঐ সকল পালন না করে হালাল-হারাম তথা মানবের তথা পরের হক বিষয়ে সজাগ রয়েছে।

এতে উপস্থিত বিজ্ঞ এ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব পরের হক ব্যাপারে সজাগ তথা হালাল হারাম পার্থক্যকারী যে উত্তম তা স্বীকার করে নিতে হল। যদিওবা তা স্বীকার করে নিতে তিনি খুবই ইতঃস্তত করছিলেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক মনে করিয়ে নবী পাক (স.) তাঁর এক প্রিয় সাহাবা'র নামাজে জানাজা পড়তে অস্বীকার করেন উক্ত সাহাবার কর্জ থাকার কারণে। অন্য প্রিয় সাহাবা হযরত আবু কাত্তাদা (রা.) উক্ত সাহাবার কর্জের জামিনদার হওয়ার পর আল্লাহর রসুল (স.) নামাজে জানাজা পড়তে সম্মত হন।

আমার মনে এ প্রসঙ্গ জাগরুক হওয়ার অন্যতম কারণ সাম্প্রতিককালে তথা ২০/২৫ বছর থেকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে গেছে। তাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ ছাড়িয়ে হয়তো কোটিও হতে পারে।

এ সকল ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ ধর্মীয় লেবাস, ফরজ-ওয়াজিব-সুন্নতসহ যার যার আক্বিদা বিশ্বাস মতে অতিরিক্ত এবাদতে রাত-দিন মশগুল রয়েছেন। কিন্তু এ সকল অসংখ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের মধ্যে ত্বকওয়া পরহেজগারী তথা হালাল-হারাম পার্থক্যকারী তথা মানবের অধিকার সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকতে শতকরা কয়জনইবা

পাওয়া যাবে। শতকরা কতজনইবা পেশাজীবনে সততা রক্ষা করে চলছে, কতজনই স্বচ্ছতা অবলম্বন করে জীবনযাপন করছে। এতে এ কালে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। যেহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের এ যুগে সাধারণ মানুষও সজাগ। অতএব, যাতে সাধারণ জনগণের কাছে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের সম্মান সংরক্ষিত হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

শুধু তাই নয়, সাধারণ জনগণ লৌকিকতার খাতিরে সম্মান না করে তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সম্মান করে সে লক্ষ্যে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণকে সজাগ থাকা চাই।

উঠা-বসা, চাল-চলনে দাম্ভিকতা

দীর্ঘদিন থেকে উপরোক্ত বিষয়ের উপর লিখব লিখব করে লিখা হয়ে উঠছিল না। অতি সম্প্রতি বেসরকারী টিভি চ্যানেল একুশে টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত একুশে সময় অনুষ্ঠান দেখতেছিলাম। রাতের বেলা সরাসরি সম্প্রসারিত এ অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠানটি প্রচারকালে এক রাত্রে এক বিশেষজ্ঞের উপবেশনের ধরন প্রত্যক্ষ করে আমার খুবই ঘৃণা জন্মে গেল।

মঞ্চের এক পার্শ্বে একুশে টিভি'র উপস্থাপক অপর পার্শ্বে একটি বৃহদাকারের সোফায় একজন, ক্ষেত্রবিশেষে দু'জন বিশেষজ্ঞ আসন গ্রহণ করেন।

ঐ রাত্রে ২ জন বিশেষজ্ঞ আসন গ্রহণ করেছিলেন। তৎমধ্যে একজন স্বাভাবিক নিয়মে ভদ্রোচিতভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁর পার্শ্বে অপর ব্যক্তি ঘনঘন এক পা সামনের দিকে লম্বা করে দিয়ে আরেক পা বাঁকা করে অপর পায়ের হাঁটুর উপর রেখে দাম্ভিকতার সাথে অতি আয়েশী ভঙ্গিমায় বসেছিলেন। প্রায় ঘন্টাখানেকের উক্ত অনুষ্ঠানে ঐ ব্যক্তি মনে হয় দীর্ঘদিনের বদ অভ্যাসের দরুণ সে-রাতের সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানেও ছাড়তে পারতেছিলেন না বা ছাড়তে চাচ্ছিলেন না।

ঐ মুহূর্তে টেলিফোন করে এ দাম্ভিক বসার ভঙ্গিমা নিয়ে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ইতস্তত করে করা হয়নি।

একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী টেলিভিশনে তাঁর অশালীন বসার দৃশ্য নিয়ে আলোচনা সমালোচনা চলছিল। গোয়েন্দাদের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনভাবে হোক তিনি তা জানতে পেরে পরবর্তীতে সংযত হয়েছিলেন বলে মনে করি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও এক প্রতিমন্ত্রীসহ একাধিক মন্ত্রী এ রকম অশালীন উপবেশন করার দৃশ্য সরকারী বেসরকারী টিভির মাধ্যমে নিয়মিত দেখতে পাই।

দুই কারণে এ শালীনতা বিবর্জিত উপবেশনের কারণ হতে পারে। এক. দীর্ঘদিন থেকে বদ অভ্যাসে পরিণত হওয়া, মানব জাতি আরামপ্রিয়, সুযোগ পেলে অতি আয়েশী তথা আরামপ্রিয় হওয়া স্বাভাবিক, তবে ব্যতিক্রমধর্মী যে নেই তা নয়।

মানবের আয়েশী খেয়াল থাকার কারণে উপবেশন করার ক্ষেত্রে আরাম করে বসতে গিয়ে প্রকাশ্যে তথা অপরজনের সামনে যে শালীনতা বর্জিত হচ্ছে কি না তা বেমালুম ভুলে যায়। এ বদ অভ্যাস ঘরোয়াভাবে করতে করতে তার কাছে স্বাভাবিক রীতি হয়ে যায়। তিনি স্থান-কাল-পাত্র না বুঝে প্রকাশ্যে যত্রতত্র অশালীনতার সাথে উপবেশন করে যান।

অপর ব্যক্তিরা হচ্ছেন : হঠাৎ করে সম্পদশালী বা ক্ষমতাবান হয়ে দাম্ভিকতায় শরীর টলমল করে। তিনি দাম্ভিকতা প্রকাশের জন্য সদা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেন। ফলে তার হঠাৎ করে সম্পদশালী বা ক্ষমতাবান হয়ে নিজে নিজে ধরাকে সরাজ্ঞান করতে দ্বিধাবোধ করে না। তিনি আত্মগরিমায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। অপর স্বল্প সম্পদশালী বা স্বল্প ক্ষমতাবান বিনয়ী, ভদ্র ব্যক্তিগণকে হেয় বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি অনেকে অর্থ-ক্ষমতা পেয়ে পুরানো অবস্থানও বেমালুম ভুলে যান।

এ সকল নব্য সম্পদশালী বা ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে উপবেশন করতে গিয়েও দাম্ভিকতা দেখিয়ে বসতে গৌরববোধ করেন মনে করি।

একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে–"অর্থ মানুষকে অমানুষ করে, কিন্তু অমানুষকে মানুষ করে না"। উক্ত প্রবাদটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রম যে নেই তা কিন্তু বলা যাবে না।

যারা অতি উন্নত চরিত্রের মানুষ তাদের হাঁটা-চলা, উঠা-বসা, কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেয়ে যায়। তাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিনয়ীভাব পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে।

যারা আরো উচ্চাঙ্গে পৌঁছে মহান আল্লাহপাককে সবসময় সর্বজ্ঞাত এবং সর্বাবস্থায় নিজের সন্নিকটে উপস্থিত মনে করেন তিনি হাঁটতে-চলতে, উঠতে-বসতে সর্বাবস্থায় নিজে নিজে ভীত সঙ্কোচিত হয়ে চলাফেরা তথা জীবনযাপন করে থাকেন। সেকালে এ সংখ্যা থাকলেও একালে এ সংখ্যা দেখা পাওয়া বিরল। এ রকম সংখ্যার ব্যক্তিত্বগণকে মহান আল্লাহপাকের ওলী বলা যাবে।

অহংকারীর পতন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই সম্পদ ও ক্ষমতার দাপটে বলীয়ান হয়ে অপরাপর মানুষের সামনে প্রকাশ্যে দাম্ভিকতা দেখিয়ে কথাবার্তা বলা, চাল-চলন, উপবেশন করা মোটেও সমীচিন নয় বলে মনে করি।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহপাক পবিত্র কোরআন মজিদে ঘোষণা করেছেন "পার্থিব ধন সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র আল্লাহই আমাদের জীবন ও সম্পদের মালিক। তিনি প্রতিদান প্রদানে মহত্তের এবং শাস্তি প্রদানে শ্রেষ্ঠতর। ফলে-ফুলে শোভিত আঙ্গুর বাগানকে তিনি নিমিষে পুষ্পশূন্য বিরাণ মাঠে পরিণত করিয়ে দিতে পারেন। অহংকারী-অত্যাচারী লোক যারা ধনে-জনে পরিপূর্ণ হয়ে মনে করে যে, এ সকল সম্পদ কোনদিন বিনষ্ট হবে না, তারা আল্লাহর শক্তিকে অবিশ্বাস করে বোকামি করে এবং অচিরেই শাস্তিভোগ করে।"–সুরা কাহফ, পারা ১৫, রুকু ৫, আয়াত ৩২-৩৪।

"অহংকারী দাম্ভিক লোকদিগকে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, এই পৃথিবীতে মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য আল্লাহ কত ফল-ফুল, তৃণ লতা ও শস্যসম্ভার সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর এত অনুগ্রহ পেয়েও অকৃতজ্ঞ মানুষ তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে না। পরলোকে অবশ্যই এই জন্য তাহাদিগকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।" –সুরা আবাসা, পারা ৩০, রুকু ১, আয়াত ২৩-৩২।

"মানুষকে যখন দুঃখ স্পর্শ করে তখন আল্লাহকে ডাকে। আল্লাহ যখন মানুষকে সুখ, সম্পদ ও অনুগ্রহ দান করেন তখন অকৃতজ্ঞ মানুষ দাবী করে যে, সে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই তাহা অর্জন করেছে।

আল্লাহ এভাবেই অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীদের ধন-জন ও সুখ-সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধন-সম্পদের অহংকার করেছিল, তাদিগকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও এরূপ অত্যাচার ও অপকৃষ্টতার জন্য কঠিন শাস্তি হতে তারা পরিত্রাণ পাবে না। তারা অবগত নহে যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার জন্য উপজীবিকা প্রশস্ত ও সংকুচিত করেন নিশ্চয়ই ইহাতে বিশ্বাসীগণের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। –সুরা যুমার, পারা ২৪, রুকু ৫, আয়াত ৪৯-৫২।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে পাকের বাণী হল :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন : আল্লাহতা'আলা বলেন, অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইয়ার। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহার কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে দোযখে ঢুকাব। অপর এক বর্ণনায় আছে, তাকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করব–মুসলিম।

হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন : মানুষ এভাবে আত্মগর্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, অবশেষে তার নাম উদ্ধৃত অহংকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে তার উপর সেই আযাবই নেমে আসে যা উহাদের উপর অবতীর্ণ হয়ে যায় –তিরমিযী।

হযরত আসর ইবনে শোয়াইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন : রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন : কিয়ামতের দিন অহংকারীদিগকে পিপীলিকার ন্যায় জড়ো করা হবে। অবশ্য প্রকৃতি অবয়ব হবে মানুষের, অপমান তাদিগকে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে নেবে। "বাতলাস" নামক জাহান্নামের কারাগারের দিকে তাদিগকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। আগুনের অগ্নিশিখা তাদের উপর ছেয়ে যাবে। আর তাদেরকে পান করানো হবে জাহান্নামীদের দেহ নিংড়ানো "ত্বানাতুল খাবাল" নামক কদর্য পুঁজ রক্ত -তিরমিযী।

হযরত উমর (রা.) একদা মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল, তোমরা বিনয়ী হও। আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন। সে নিজের কাছে ছোট এবং মানুষের চোখে সম্মানী, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ তাকে হেয় করে দেন। সে মানুষের চোখে তুচ্ছ পরিণত হয় এবং নিজের কাছে সে বড়। পরিশেষে সে মানুষের কাছে কুকুর কিংবা শুকর অপেক্ষা ঘৃণিত ও তুচ্ছে পরিণত হয়।

জজিরতুল আরব ও মূলকে শাম'র কথা

বিশ্বে মানব বসতি শুরু হয় জজিরতুল আরব ও মুলকে শাম থেকে। উভয় পাশাপাশি অঞ্চল কিন্তু আবহাওয়া, পরিবেশ, জমির ধরন প্রায় অনেক কিছুতেই কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। বিশ্বের প্রথম ঘর খানায়ে ক্বাবা জজিরতুল আরবে। জজিরতুল আরব-এর অধিকাংশ এলাকা মরুভূমি পরিত্যক্ত বলা চলে।

অপরদিকে, জজিরতুল আরবের উক্ত সংলগ্ন মূলকে শাম অনেকটা উর্বর। মরুভূমি তথা পরিত্যক্ত এলাকা জজিরতুল আরবের মত নয়। জজিরতুল আরবের অধিকাংশ পাহাড়-পর্বত পাথরবেষ্টিত। অপরদিকে, মুলকে শামের পাহাড়-পর্বত অনেকটা আবাদযোগ্য উর্বর বলা চলে। বিশ্বের প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) কর্তৃক খানায়ে ক্বাবা নির্মাণ এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক পুনঃ নির্মাণ হলেও, মূলত অধিকাংশ নবী রসুলের পদচারণা জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে মুলকে শামে। মুলকে শামের বাহিরে অন্যত্র এমনকি আমাদের উপমহাদেশেও নবী রাসূলগণের আগমন ঘটেছিল বলে ইতিহাসবিদগণের মধ্যে অনেকে মন্তব্য করে গেছেন।

১ লক্ষ ২৪ হাজার বা ততোধিক নবী রসুলগণের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই একমাত্র জজিরতুল আরবের মক্কা মুকাররমাবাসী ছিলেন। বাকী লক্ষাধিক বা লক্ষ লক্ষ নবী রসুল তথা আল্লাহপাকের মনোনীত বা প্রেরিত মহাপুরুষগণ মুলকে শামসহ অন্যত্র প্রেরিত হয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত কোনো ইতিহাসবিদ জজিরতুল আরবে অন্যকোন নবী রসুল (স.)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে গেছে বলে জানতে পারা যায়নি। তবে মুলকে শামসহ অন্যত্র থেকে নবী রসুলগণ সেকালে সে নিয়মে মক্কা মুকাররমায় এসে হজ্ব করে পুনরায় নিজ এলাকায় ফিরে যেতেন বলে ইতিহাসবিদগণ মন্তব্য করে আসছেন।

একালে জজিরতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপ বলতে ৭টি দেশকে নিয়ে বুঝায়। যথা : সৌদি আরব, ইয়েমেন, সালতানাত অব ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন ও কুয়েত। তবে ইরাক ও জর্ডানের দক্ষিণাংশের অংশবিশেষ জজিরতুল আরবের অংশভুক্ত বলা হয়ে থাকে।

জজিরতুল আরবের মধ্যে সৌদি আরবের পাশাপাশি ইয়েমেন সালতানাতের ওমান ও বাহরাইন-এর হাজার হাজার বছরের ইতিহাস তথা মানব বসতির কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েতে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস তথা মানব বসতির কথা জানতে পারা যায় না।

অপরদিকে, জজিরতুল আরবের উত্তর পার্শ্বে মূলকে শামের একালের দেশগুলো হল : জেরুজালেমকে বুকে ধারণ করে ফিলিস্তিন (জবরদখলী ইসরাইল) লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, ইরাকের দক্ষিণাংশ, তুরস্কের পূর্ব-দক্ষিণাংশ, মিশরের পূর্বাংশ। তবে মুলকে শামের বর্তমান চতুর্দিক সীমানা প্রকৃতপক্ষে কতটুকু তা তথ্য তালাশে উদঘাটন করতে অপারগ হই।

আমিরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর আমলে মুলকে শাম ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়। তখন হতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুটা আগে পর্যন্ত মুলকে শাম ও জজিরতুল আরব একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হযরত আলী (ক.) খেলাফতের রাজধানী মদিনা মুনাওয়ারা থেকে কুফায় স্থানান্তর করলে পরে এ উভয় অঞ্চল হযরত আলী (ক.)-এর পরবর্তী দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো, ইস্তাম্বুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছিল।

তুর্কী সালতানাতের শাসন ব্যবস্থার শেষের দিকে সুলতান তথা আমিরগণের নানান দুর্বলতার কারণে বৃটিশের পৃষ্ঠপোষকতা ও ইন্ধনে আরব রাষ্ট্রসমূহ তুর্কী সালতানাতের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসে। ফলে হাজার হাজার বছরের আরব রাষ্ট্রগুলোর মানচিত্র ছোট-বড় নানানভাবে আলাদা আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে ভাগ হয়ে যায়। তবে বৃটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় সকল দেশে রাজতন্ত্র চালু ছিল ও রয়েছে বলা যায়। ফলে মুলকে শামও কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা দেশে পরিণত হয়।

মূলতঃ তুর্কী সালতানাতের শত শত বছরের শাসনামলের শেষের দিকে অযোগ্য, অদক্ষ শাসক এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী সালতানাত-এর পরাজয় মুসলিম জাহানে নানা বিপর্যয় নেমে আসে। যেহেতু বিশ্বে মুসলিম জাহানের বিশাল অংশ তুর্কী সালতানাতের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

পূর্ব ইউরোপসহ তুর্কী সালতানাতের বিশাল সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হয়ে ভাগ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বিশ্বের একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ নাম ও অঞ্চল মুলকে শামও টুকরা টুকরা হয়ে ভাগ হয়ে যায়।

ফলে প্রাচীন মুলকে শাম তথা শামদেশ আর বহাল রয়েছে বলা যাবে না। তারপরও আজকের সিরিয়াকে (আরবী নাম সুরিয়া) তারা শামদেশ বলে দাবী করে আসছে যার রাজধানী দামেস্ক।

গত শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত জজিরতুল আরব মরুভূমিপ্রবণ, অনুন্নত সেকেলে অঞ্চল ছিল। অপরদিকে মুলকে শাম বহু এগিয়ে ছিল। তথায় তখন শহর-বন্দর-নানান-ব্যবসা বাণিজ্যে বিশ্বে একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল ছিল। রেল যোগাযোগ চালু ছিল। এমনকি দামেস্ক থেকে মদিনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত রেল যোগাযোগ চালু ছিল। শত বছর পূর্বে যারা হজ্ব করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে রেলযোগে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে দামেস্ক জেরুজালেমসহ মুলকে শামের প্রাচীন পবিত্র শহরসমূহে গমন করত।

অপরদিকে, জজিরতুল আরব ১৯৩০-এর দশক থেকে পর্যায়ক্রমে তেলপ্রাপ্তির পর উন্নয়নের জোয়ার বইতে শুরু করে। তন্মধ্যে ইয়েমেনে অভ্যন্তরীণ দীর্ঘ সংঘাতের কারণে পিছিয়ে রয়েছে। জজিরতুল আরব মরুভূমি অঞ্চল বিধায় সেকালে খেজুর বাদে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু উৎপন্ন হত না। অপরদিকে, মুলকে শাম অত্যধিক মরুভূমি অঞ্চল না হয়ে আবাসযোগ্য থাকায় পাহাড়ের সমতলে তীন, জয়তুনের পাশাপাশি কমলা, আঙ্গুর, আনার, আপেলসহ নানান দামী দামী ফলমূল উৎপন্নের জন্য প্রসিদ্ধ। শুধু তাই নয় মুলকে শামে ২০ প্রকারের আঙ্গুর উৎপন্ন হয়।

মুলকে শাম-এর প্রাচীন নানান স্থাপনা-শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানেও এগিয়ে ছিল। ফলে মুলকে শামে রয়েছে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের দীর্ঘ ইতিহাস। ইহা স্বাভাবিক যে–অঞ্চল যত সমৃদ্ধ সে–অঞ্চল দখলে নেওয়ার জন্য অন্য প্রভাবশালী দেশের লোলুপদৃষ্টি পড়ে। মুলকে শামের ক্ষেত্রেও তার ভিন্নতা হয়নি।

অপরদিকে, জজিরতুল আরব যেমনি মরুপ্রবণ অঞ্চল তেমনি খুবই অনুন্নত ও স্বল্পবসতিপূর্ণ অঞ্চল ছিল। ফলে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝতে পারা যায় বিশ্বের ইতিহাসে কোন সময় জজিরতুল আরব দখল নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন সংঘাত হয়নি। শুধুমাত্র আমিরুল মোমেনীনগণের ওফাতের পরপর দামেস্কের রাজতন্ত্র নিয়ে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ছাড়া।

ইতিপূর্বে অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে, জজিরতুল আরব আল্লাহর আখেরী রসুল হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর খাস এলাকা। লোহিত সাগরের ৭০/৮০ কিলোমিটার পূর্বে মক্কা মুকাররমায় তিনি আবির্ভূত হন। মক্কা মুকাররমার ৪২৫ কিলোমিটার উত্তরে মদিনা মুনাওয়ারায় তিনি পরবর্তী জীবন কাটান ও ওফাতপ্রাপ্ত হন।

আল্লাহর রসুল (স.)-এর আমলে জজিরতুল আরব ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়ে মদিনা মুনাওয়ারার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা হিসাবে জজিরতুল আরবের পুরাটাই মুসলিম অধ্যুষিত, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা খুবই নগণ্য।

অপরদিকে মুলকে শামে সিরিয়া, জর্ডান, ইরাকের পূর্বাঞ্চল, তুরস্কের পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত। এখানেও স্বল্পসংখ্যক অন্যান্য ধর্মাবলম্বী রয়েছে তবে তাও খুবই নগণ্য।

লেবাননে খ্রীস্টান ও মুসলমান প্রায়ই সমান সমান ফলে লেবাননের ইতিহাস সংঘাতের ইতিহাস। অপরদিকে ফিলিস্তিন একটি ব্যতিক্রমধর্মী দেশ। যেহেতু বৃটিশরা আরব রাষ্ট্রসমূহের নানা প্রতিকূলতার সুযোগে বহির্বিশ্ব থেকে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসন শুরু করে এবং তা বাড়াতে বাড়াতে ১৯৪৮ সালে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ করে দেয় যা আরব ফিলিস্তিনীরা মেনে নিতে নারাজ। ফলে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানবতার উৎকর্ষ সাধনের এহেন যুগেও ফিলিস্তিনে অব্যাহত রক্ত ঝরে যাচ্ছে। বৃটেন-আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বের সভ্যদেশের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে জবরদখলদার ইসরাইল অসহায় স্বদেশবাসী ফিলিস্তিনীদের উপর নির্মম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনীরা তাদের মাতৃভূমিতে ইহুদীদের বুলেটের খোরাক হয়েও পরিবার পরিজন নিয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

মসজিদে জামা'য়াত ব্যবস্থাপনা

মুসলমানদের ক্ষেত্রে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ বিশেষ ওজর না থাকলে মসজিদে গিয়ে জামায়াতে পড়তে হবে। অবশ্য আমাদের দেশে মহিলাগণের পক্ষে সে অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি।

দেশে মসজিদে জামায়াত পাঁচওয়াক্ত ইমাম সাহেব ও জুমা খতীব সাহেবের নিয়ন্ত্রণে। স্বল্পসংখ্যক বড় বড় মসজিদ বাদে অধিকাংশ মসজিদে জুমার নামায পাঁচওয়াক্তের ইমাম সাহেবই পড়ায়ে থাকেন।

দেশে কয়েক লক্ষ মসজিদের মধ্যে কয়েকটি মসজিদ সরকারী নিয়ন্ত্রণে বাদে বাকি সকল মসজিদ বেসরকারী ২ প্রকারের নিয়ন্ত্রণে বলা যাবে :

১. মোতোওয়াল্লীর একক নিয়ন্ত্রণে ২. কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণে। উভয় নিয়ন্ত্রক খতীব, ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম নিয়োগ দিয়ে থাকে।

চাঁদা না নিয়ে মোতোওয়াল্লী তথা মোতোওয়াল্লী পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এ রকম মসজিদ শতকরা ২/১ টার বেশী হবে বলে মনে হয় না।

অর্থাৎ বর্তমানে বাংলাদেশের শতকরা ২/১টি মসজিদ বাদে বাকী সকল মসজিদ দেশ-বিদেশের জনগণের দানে পরিচালিত।

মসজিদের নানান সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি উভয় প্রকার নিয়ন্ত্রক এবং মতাদর্শ চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী ইমাম সাহেব ও খতীব সাহেবের চলতে হয়।

আবার উভয় প্রকার নিয়ন্ত্রকের আক্বিদা বিশ্বাস অনুযায়ী ইমাম, খতীব নিয়োগ দান করে থাকে। এমন নিয়ন্ত্রকও রয়েছে তথা মোতোওয়াল্লী, সভাপতি, সেক্রেটারী যাদের জন্য মসজিদের প্রথম কাতারের বিশেষ স্থানে আসন তথা জায়নামাজ বিছানো থাকে। মসজিদের অর্থ সম্পদ নিয়ে নানান কথা রয়েছে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছিনা।

এ কালের মানুষের অত্যধিক ব্যস্ত জীবন। তার উপর নানান শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে। ফলে মসজিদে জামায়াত পড়তে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

যথা : ১। মসজিদের ঘড়ি নিয়ে সমস্যা : মসজিদের ঘড়ি ২/১ মিনিট ফার্স্ট থাকলে অনেকে যেমনি পুরাপুরি জামায়াত পায় না তেমনি ৩/৪ মিনিট স্লো থাকলে জামায়াতের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয়।

মসজিদের জন্য দামী দেওয়াল ঘড়ি আবশ্যক মনে করি। শুধুমাত্র ১ বা ২ মিনিট স্লো থাকলে মুসল্লীগণের জামায়াত পেতে অত্যধিক সুবিধা হয় বলে আমার বিশ্বাস।

২। কোন কোন ইমাম সাহেব এত দ্রুত নামায পড়ান যে যোহর, আসর ২/৩ মিনিটে-এশা ৩/৪ মিনিটে শেষ হয়ে যায়। আবার কোন কোন ইমাম সাহেব এরকমও আছেন যোহর-আছর নামায ১০ মিনিট বা তারও বেশী সময় এবং এশার নামায ১৫ মিনিট বা ২/১ মিনিট কম-বেশী সময় নিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে মুসল্লীগণের ব্যস্ততা ও অসুস্থতা চিন্তা করে একালে মধ্যম পন্থার সময় ক্ষেপণ করা অধিকতর উত্তম মনে করি।

৩। আমাদের দেশে জামায়াতের পরপর মুনাজাত করার পক্ষে মনে হয় প্রায় সকলে একমত। দ্বিমতকারীর সংখ্যা অতি নগণ্য। কোন কোন ইমাম সাহেব হাত তোলা মাত্র ২/৩ সেকেন্ডে মুনাজাত সমাপ্ত করেন। আবার কোন কোন ইমাম সাহেব মুনাজাত দীর্ঘক্ষণ সময় নিয়ে করে থাকেন।

৪। এমন অসুস্থ বয়স্ক ইমাম সাহেবও রয়েছেন যাদের জামায়াত পড়াতে গিয়ে অত্যধিক ভুল-ভ্রান্তি হয় অথবা কেরাত ছহী নয়। তারপরও স্বল্প বেতন, আকিদা বিশ্বাসে সমমনা অথবা আত্মীয়তা বা অন্যকোন সংশ্লিষ্টতার কারণে তাদেরকে বহাল রেখেছে।

৫। দেশে এমন মসজিদের সংখ্যাও কম নয় আসর নামাজের পর মুনাজাতের সাথে সাথে এবং যোহর, মাগরিব, এশার নামাযের শেষ মুনাজাতের সাথে সাথে মুয়াজ্জিনের অন্যত্র ব্যস্ততা থাকায় তাড়াতাড়ি মসজিদ বন্ধ করে চলে যেতে চায়। এক্ষেত্রে মুনাজাতের পর কম করে হলেও ৫/৭ মিনিট মসজিদ খোলা রাখা জরুরী বলে মনে করি যদি কোন মুসল্লী মসজিদের অভ্যন্তরে এবাদতে রত থাকে। যেহেতু শেষ মুনাজাতের পরও অনেক মুসল্লী ২/৪ মিনিট বা ৫/৭ মিনিটের কিছু সময় নামায, তছবীহ তাহলীল তথা এবাদত বন্দেগীতে থাকে। মুনাজাতের পর যাদের ৫/৭ মিনিটের অধিক সময় দরকার তাদের মসজিদ থেকে বের হয়ে বারিন্দায় চলে আসা উচিৎ হবে বলে মনে করি।

৬। অনেকে জামায়াতের আগে-পরে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে চায়। বহু মসজিদে অতি সংরক্ষণের নামে কোরআন মজীদ মসজিদের আলমিরায় তালাবদ্ধ থাকে। কিন্তু কোরআন মজীদ মসজিদে সহজলভ্য হওয়া চাই।

৭। মসজিদে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছোট ছোট শিশু-কিশোররা নামাজ পড়তে যাওয়া শুভ লক্ষণ। কিন্তু আমাদের দেশে তাদেরকে দুষ্টামির কারণে তিরস্কার, গালমন্দ করে থাকে। মাঝেমধ্যে তাদেরকে প্রহারও করা হয়ে থাকে।

তাদেরকে দুষ্টামির কারণে বারেবারে বারণ করতে হবে। তারপরও এ জন্য গালমন্দ করা বা তিরস্কার করা যাবে না, শিশুতো শিশুই।

৮। বর্তমানকালে মোবাইল ফোন অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং মসজিদে মুসল্লীদের মধ্যে মনে হয় অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যক মুসল্লীর মোবাইল ফোন সাথে থাকে। কাজেই মুয়াজ্জিন একামতের আগে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখার জন্য ঘোষণা দেওয়ার প্রথা হওয়া চাই। যেহেতু মোবাইল যেমনি সাথে থাকার জিনিস তেমনি তা বন্ধ করতে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়।

৯। মসজিদে জামায়াত পড়তে গিয়ে সামনের কাতারের আগে জুতা, সেন্ডেল রাখার সুযোগ থাকা চাই। অনেক মসজিদে এ সুযোগ থাকে না ফলে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। বিভিন্ন দেশে স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা না থাকায় সামনে জুতা, সেন্ডেল রাখলে অনেক মুসল্লী কটূকথা বলে।

১০। কারো মাথায় টুপি না থাকলে পার্শ্বস্থ মুসল্লীরা মাথায় টুপি দেওয়ার জন্য তাগাদা দিতে থাকে। যেন মাথায় টুপি না দিলে নামাজই হবে না। এদের ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা না থাকাটা অন্যতম কারণ।

১১। জুমা'য়ার নামাজ : একালে জুমা'য়ার নামাজ পড়তে গিয়ে অস্বস্তিকর ও বিড়ম্বনার স্বীকার হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত যথা–

ক) সাম্প্রতিককালে বহু মসজিদে খুতবার আগে খতীব সাহেব মাইকে নছিহত করেন। মসজিদের ভিতর মাইকের শব্দ এত বাড়িয়ে দেওয়া হয় যা অস্বস্তিকর। ইহা ইচ্ছাকৃতভাবে, এতে শত শত মুসল্লী খুবই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে।

খ) খতীব সাহেব ঐ নছিহত করতে করতে জোশের কারণে অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় রক্ষা করতে পারেন না। তা সওয়াবের নামে শত শত মুসল্লীগণকে কষ্ট দেয়া নয় কি?

গ) অধিকাংশ মসজিদে জুমায়া'র সময় দান বাক্স নিয়ে মুসল্লী থেকে টাকা তোলা হয়। কিন্তু মুসল্লী সমাগম বেশি হলে টাকা কিছুটা বেশি পাওয়ার জন্য খুতবা শুরুর আগে আগে বা জুমার পরপর টাকা না তুলে খুৎবা শুরু হলে দান বাক্সে টাকা তেলা হচ্ছে বেশিরভাগ মসজিদে। খুৎবা শুরু হওয়ার পর এভাবে টাকা তোলা ধর্মমতে গ্রহণযোগ্য নয়। টাকা কিছুটা বেশী পেতে খতিব সাহেব নিজে বা মসজিদ নিয়ন্ত্রকের ইচ্ছামত খুৎবা শুরুর পর টাকা তোলার প্রবণতা বন্ধ করে খুৎবা শুরুর আগে বা জুমা'য়ার নামাজের পরেই করা চাই।

ঘ) সাম্প্রতিককালে জুমা'য়ার পর শেষ মুনাজাতে মুসল্লী সংখ্যা কম থাকায় খতীব সাহেব জুমার নামাজের পরপর মুনাজাতকে দীর্ঘায়িত করতেছেন। এ রেওয়াজ আগে ছিল না। এতে মুসল্লীগণকে ইচ্ছাকৃতভাবে আটকিয়ে বিড়ম্বনায় ফেলা নয় কি? ২য় তথা শেষের মুনাজাত ইচ্ছা করলে আধঘন্টা একঘন্টা করুক। যাদের ইচ্ছা থাকবে যাদের ইচ্ছা চলে যাবে।

ঙ) জুমা'য়ার পর বড় বড় মসজিদগুলোতে বিয়ের আক্দ হয়ে থাকে। খতীব সাহেব ঐ সময় নছিহত, লম্বা মুনাজাত ইত্যাদির মাধ্যমে সময় দীর্ঘায়িত না করা চাই।

পরিশেষে বলতে চাই একালে মানুষের যেমনি অত্যধিক ব্যস্ততা তেমনি নানা রোগব্যাধিসম্পন্ন মুসল্লী রয়েছে বিশেষ করে ডায়বেটিস রোগীর সংখ্যা কম নয়। অতএব, মোতোওয়াল্লী/কমিটি এবং ইমাম সাহেব/খতীব সাহেব-এর প্রতি উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দেশে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে কলুষিত পরিবেশের অনুপ্রবেশ

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সংবাদপত্রে তথা প্রচার মাধ্যমে ভণ্ড পীরগণের আবির্ভাব, মাদ্রাসা প্রধানগণের আর্থিকসহ নানান দুর্নীতি, ধর্মীয় স্পর্শকাতর বিষয়ে ফতোয়া নিয়ে নানা কথা ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে।

নিজে একজন মহান ওলী তথা পীর সাহেবের মুরীদ এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় উক্ত লেখালেখি দৃষ্টিগোচর হলে ব্যথিত হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

মূলত ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে কলুষিত পরিবেশের অনুপ্রবেশ বেশীদিন থেকে নয়। বৃটিশ আমলের কথা বাদই দিলাম। পাকিস্তান আমলের শেষের দিকেও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে সকল বিষয়ে সচ্ছতা ছিল বলতে পারি।

সরকারী মাদ্রাসা, কওমী মাদ্রাসা, মসজিদের ইমাম, খতীব, মুফতী, মুহাদ্দেস, পীর, সূফী তথা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রত্যেকটি স্তরে প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখায় সচ্ছতা ছিল। যদিওবা আক্বিদা বিশ্বাস নিয়ে বাড়াবাড়ি এখনের চেয়ে তখন আরো প্রকট ছিল।

বস্তুত ধর্মীয় সকল কর্মকাণ্ডে তখন দুনিয়া ভোগের, দুনিয়া পাওয়ার, ধন সম্পদের অধিকারী হওয়ার, বিলাসী জীবন যাপন করার প্রবণতা ছিল না।

মূলত আমাদের এদেশে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে কলুষিত পরিবেশের সূত্রপাত সৌদি আরব থেকেই বলে মনে করি। যেহেতু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও পাকিস্তান আমলের মত সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্বযাত্রী বাদে, সৌদি আরব যাতায়াতের তেমন কোন সুযোগ ছিল না।

স্বাধীনতার কয়েক বছর পর সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে কিছুদিনের ব্যবধানে তথা ১৯৭৬/৭৭ সালের দিকে ঢাকায় প্রথম সৌদি দূতাবাস খোলা হয়। সৌদি আরবের প্রথম রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল্ খতীব রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিয়ে ঢাকায় অবতরণ করলে দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহের প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁর ছবিসহ ফলাও করে এ সংবাদ প্রচার করা হয়। তিনি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (আজকের শেরাটন)-এ অবস্থান করে তথায় দূতাবাসের অস্থায়ী কার্যক্রম শুরু করেন। এর কিছুদিনের ব্যবধানে সৌদি এয়ারলাইন্স ঢাকা-জেদ্দা ফ্লাইট শুরু করে। পরবর্তীতে ঢাকার সাথে রিয়াদ, দাহরান, মদিনা মুনাওয়ারা বিমান বন্দরে সম্প্রসারিত হয়।

জেদ্দা-ঢাকা ফ্লাইট চালু হওয়ার সাথে সাথে সংবাদপত্রে বড় আকারের বিজ্ঞাপন দিয়ে ওমরাহ করার জন্য যাত্রী আহ্বান করতে থাকে। ঐ সময় ১১ হাজারের কিছু অধিক বাংলাদেশী টাকায় সৌদি এয়ারলাইনে ওমরাহ করার সুযোগ দিচ্ছিল।

ফলে তখন থেকে স্রোতের মত ওমরাহর নাম করে বাংলাদেশীরা সৌদি আরব যাওয়া শুরু করে। তন্মধ্যে একভাগ হল তথায় অবৈধভাবে থেকে গিয়ে টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে, আর এক ভাগ হল দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির পক্ষে সৌদি শেখগণ থেকে চাঁদা কালেকশনের উদ্দেশ্যে। তন্মধ্যে মাদ্রাসা, মসজিদ, এতিমখানা,

হেফজখানা তথা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চাঁদা কালেকশনের উদ্দেশ্যে। পরবর্তীতে তা সৌদি আরবের পাশাপাশি কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, ওমান এ সকল আরব রাষ্ট্রসমূহেও চাঁদা কালেকশনের প্রবণতা চালু হয়।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির কল্যাণে আরব রাষ্ট্রসমূহে চাঁদা কালেকশন একটি শুভ উদ্যোগ। এর ফলে দেশে সাবেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির ইমারতে প্রভূত উন্নতি সাধন করে। সাথে সাথে নতুন নতুন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

কিন্তু এ চাঁদা কালেকশনের দ্বারা ধর্মীয় সেবার পাশাপাশি নানান অপকর্ম দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা আত্মসাতের কথা অস্বীকার করা যাবে না।

আরব রাষ্ট্রসমূহের সাথে এই আর্থিক যোগাযোগের সমান্তরালে, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা তথায় যোগাযোগ তথা চাঁদা কালেকশনের জন্য যাওয়া-আসা করছে না তারা দেশের অভ্যন্তরে নানাভাবে অর্থলাভের সুযোগে তৎপর হয় বলতে পারি। ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে কলুষিত পরিবেশের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তাদের অর্থ সম্পদের আগ্রহের কারণে নানাদিক দিয়ে কলুষিত পরিবেশ বেড়ে যায়। অবশ্য এ বিদেশী তথা আরবীয় রাষ্ট্রসমূহের চাঁদা তথা অবদানের দ্বারা সবক্ষেত্রে যে কলুষিত পরিবেশ হচ্ছে তা কিন্তু নয়। অপরদিকে, যারা প্রকৃত তাক্বওয়া পরহেজগার দুনিয়াবিমুখ তাঁরা অনেকটা অন্তরালে চলে যাচ্ছেন বলা যাবে। আজ সারাদেশে এ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে কলুষিত পরিবেশের কারণে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত আদর্শের উপর আঘাত আসছে। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের প্রতি মনের গভীর থেকে শ্রদ্ধাবোধ লোপ পাচ্ছে।

এ জাতীয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের কাছে টাকাওয়ালাদের প্রতি সম্মানবোধ পরিলক্ষিত হয় অত্যধিক। এ টাকাওয়ালারা তথা ধনীরা দুর্নীতিবাজ বা সুদখোর, ঘুষখোর হোক তাতে কিছু যায় আসে না।

ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের মধ্যে তুলনামূলক পীরের কথা অত্যধিক শোনা যায় এবং ভণ্ডপীর নামে অহরহ লেখালেখি সংবাদপত্রে আসছে। এর মূলে কিন্তু ধর্মের নামে অর্থলাভ করা। আজ সচেতন ত্বাকওয়া পরহেজগার ব্যক্তিগণ সূফীইজম তথা ত্বরীকত থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণকে বুঝতে হবে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের যুগে এ কালে সাধারণ কৃষক-শ্রমিকরাও সচেতন। তারা ধর্মীয় হুকুম-আহকাম যথাযথ না বুঝলেও ন্যায়-অন্যায়, ধর্মের নামে অর্থ আত্মসাৎ, হক পীর, ভণ্ডপীর এসবের পার্থক্য অনায়াসে বুঝে নিতে পারে।

এ কালে এমন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সংখ্যা কম নয়, যাদের গাড়ি বাড়ি সহ নানা রকম ব্যয় পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু আয়ের সঠিক উৎস দেখা যায় না। এ কালে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ যে যে পদে বা দায়িত্বে আছেন, তিনি তাঁর সে পদকে ব্যবহার করে ধন সম্পদ অর্জন, দুনিয়ায় আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাসে জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদিতে নিমগ্ন বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।

আগেই উল্লেখ করেছি, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের মধ্যে ত্বাকওয়া পরহেজগারওয়ালা মহান আল্লাহপাকের আওলিয়ায়ে কেরামগণ যে রয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। শুধু তাই নয়, দুনিয়াবিমুখ এ সকল মহান ওলিগণকে খুঁজে বের করে তাদের সংস্পর্শ লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করা চাই।